নির্বাচিত সামবেদীয়ব্রাহ্মণ ও তদুত্তরবর্তী সাহিত্যে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি: একটি সমীক্ষা

পিএইচ.ডি. গবেষণা নিবন্ধ
(আর্টস)

গবেষিকা

সুতপা মণ্ডল

নির্দেশিকা

ড. কাকলী ঘোষ

অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪

প্রস্তাবনা

নদীর স্রোতের ন্যায় প্রবহমান সময়ের গতিতে অনেক কিছুই যেমন বিলুপ্ত হয়ে যায়, তেমনি আবার পরিবর্তিত সময়কে পাথেয় করে কিছু বিষয় আরও পুষ্টি সম্পাদন করে পরিপূর্ণতা লাভ করে। দুরূহ বৈদিক সাহিত্যরূপ মহাসমুদ্রে অবাধ অবগাহনের এক অন্যতম পরিপন্থী হল 'নির্বচন'। এটি শব্দের অর্থনির্ণয়ের পাশাপাশি, উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধেও পাঠকগণকে অবগত করে। 'নির্বচন' বৈদিক যুগের সাহিত্যকে সহজবোধ্য ও সমৃদ্ধি প্রদান করেছে এবং সময়ের গতিতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত না হয়ে পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের মানস-চক্ষুতে বিরাজিত থেকে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যকেও অনন্যতা প্রদান করেছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে, বৈয়াসিক *মহাভারত*-এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামের নির্বচনসমূহ। বৈদিক থেকে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য অবধি ব্যাপ্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করেই প্রস্তুত "নির্বাচিত সামবেদীয়ব্রাহ্মণ ও তদুত্তরবর্তী সাহিত্যে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি: একটি সমীক্ষা" নামক গবেষণা নিবন্ধটিতে নির্বচনগুলির পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে *নিরুক্ত* নামক নির্বচনশাস্ত্রে যাস্কাচার্য দ্বারা উল্লিখিত পদ্ধতিত্রয় এবং তদনুসারে 'অগ্নি' শব্দের নির্বচনসমূহকে স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেই লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হয়েছি। এছাড়াও বিষয়গত একঘেয়েমি নিবারণের জন্য পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের সাথে শব্দগুলির নির্বচন অনুসারে উৎসসন্ধান এবং তুলনাত্মক আলোচনাতেও মনোনিবেশ করা হয়েছে।

'ভূমিকা' ও 'উপসংহার' সহ বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়টি 'ভূমিকা', দ্বিতীয় অধ্যায়টি 'নির্বাচিত সামবেদীয় ব্রাহ্মণসমূহে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি', তৃতীয় অধ্যায়টি '*নিরুক্তে* প্রাপ্ত সামবেদীয় শব্দসমূহের নির্বচন', চতুর্থ অধ্যায়টি '*বৃহদ্দেবতা* ও *মহাভারতে* প্রাপ্ত নির্বচন', পঞ্চম অধ্যায়টি '*বেদমীমাংসা* ও *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে বেদব্যাখ্যায় নির্বচন', ষষ্ঠ অধ্যায়টি 'নির্বাচিত বৈদিকগ্রন্থসমূহে ও *মহাভারতে* প্রাপ্ত কতিপয় দেববাচক শব্দের তুলনাত্মক আলোচনা' এবং সর্বশেষ সপ্তম অধ্যায়টি 'উপসংহার'। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে বক্তব্যের সমর্থনে 'তথ্যপঞ্জি' সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা নিবন্ধের শেষে 'পরিশিষ্ট' ও 'গ্রন্থপঞ্জি' যথাযথভাবে বিদ্যমান।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'B.A.', 'M.A.' ও 'M.Phil.' করার পর 'Ph.D' করার সুযোগ পেলে, ২০১৯ সালের ২০ই অগাস্ট এই বিভাগে গবেষণার জন্য আমার নিবন্ধীকরণ হয়। যেহেতু 'M.Phil.' এর আকরগ্রন্থ ছিল *নিরুক্ত* নামক নির্বচনশাস্ত্র সেইজন্য গবেষণার বিষয় ও দিক নিয়ে আলোচনার সময় আমার অধ্যাপিকা ড. কাকলী ঘোষ মহাশয়া, যিনি বস্তুত এই গবেষণা কার্যের নির্দেশিকা, আমাকে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের নির্বচন ব্যাপারে পড়াশোনার জন্য নির্দেশ দেন। প্রাথমিকভাবে চারটি সংহিতার অন্তর্গত একাধিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অসংখ্য নির্বচন পাওয়া যায়। শোধপ্রবন্ধের পরিধি সংক্ষেপ করার জন্য *সামবেদসংহিতার* কয়েকটি ব্রাহ্মণগ্রন্থ এবং পরবর্তীকালে রচিত কয়েকটি লৌকিক ও বৈদিক গ্রন্থ আধার হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সেখানে প্রাপ্ত নির্বচনগুলির *নিরুক্ত*কার অনুসারে পদ্ধতিগত অনুসন্ধান মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়।

যেকোনও গবেষণা কার্যের শুরুর দিকে প্রধান যে বাধা থাকে, তা হল তথ্যের অপর্যাপ্ততা। আমার গবেষণার কাজেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যাস্কাচার্যের নির্বচনপদ্ধতি গুলির অর্থবোধের ক্ষেত্রে নানাবিধ মত পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে আমার অধ্যাপিকার দিগ্-নির্দেশে 'অগ্নি' শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি এবং *নিরুক্তে* উল্লিখিত 'পরোক্ষবৃত্তি' ও 'অতিপরোক্ষবৃত্তি' শব্দ হিসাবে নির্বচন অনুযায়ী বিশ্লেষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ড. কাকলী ঘোষ মহাশয়ার কাছে গবেষণার কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং মনে করি এই প্রাপ্তি আমার পুণ্যকর্মেরই ফলস্বরূপ। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে স্নেহে, শাসনে তাঁর সঠিক পথনির্দেশ ও সহযোগিতা গবেষণা নিবন্ধটি সম্পূর্ণ হতে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছে। শাস্ত্রীয় পরিসর ও ব্যবহারিক জীবনে তাঁর থেকে পাওয়া পরামর্শ ও উপদেশ আমার জীবনের পাথেয় স্বরূপ।

এখানে স্বীকার করতেই হয় যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ আমাকে পড়ার ও গবেষণা করার জন্য যে স্থান প্রদান করেছে, তার সৌজন্যেই অধ্যাপনার কাজে এবং গবেষণার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পেরেছি। অতএব কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি সংস্কৃত বিভাগের অন্যান্য সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বৃন্দকে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল ও ডিপার্টমেন্টাল লাইব্রেরি, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার্ মেন লাইব্রেরি, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। এছাড়াও Internet Archive, National Digital Library of India, Encyclopaedia Britanica, Shodhganga- এই কয়েকটি ডিজিটাল লাইব্রেরি ও রিসোর্সের প্রতি ঋণ স্বীকার করি।

সব শেষে বললেও যাদের মূল্যবান অবদানের কথা অত্যন্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করতেই হবে, তারা হলেন আমার পরিবার ও বন্ধু। তাঁদের নিরন্তর অনুপ্রেরণা নানা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে, কাজে মনোনিবেশ করতে সহযোগী হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে একবিংশ শতক পর্যন্ত নির্বচনের ব্যাপ্তি যেন মহাসমুদ্রের ন্যায়। আমি খুব সামান্যই পর্যালোচনা করতে পেরেছি। এই বিষয়ের ওপর গবেষণার পরিসর ও প্রয়োজন দুটিই বিদ্যমান। অতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে তা গবেষকগণ কর্তৃক গবেষণার দ্বারা প্রকাশিত ও উদ্ঘাটিত হবে।

***

সূচিপত্র

			পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রস্তাবনা		:	১-২
সূচিপত্র		:	৩
প্রথম অধ্যায়	ভূমিকা	:	৪-৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	নির্বাচিত সামবেদীয় ব্রাহ্মণসমূহে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি	:	১০-১৫
তৃতীয় অধ্যায়	*নিরুক্তে* প্রাপ্ত সামবেদীয় শব্দসমূহের নির্বচন	:	১৬-২০
চতুর্থ অধ্যায়	*বৃহদ্দেবতা* ও *মহাভারতে* প্রাপ্ত নির্বচন	:	২১-২৫
পঞ্চম অধ্যায়	*বেদমীমাংসা* ও *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে নির্বচন	:	২৬-২৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	নির্বাচিত বৈদিক গ্রন্থসমূহে ও মহাভারতে প্রাপ্ত কতিপয় দেববাচক শব্দের তুলনাত্মক আলোচনা	:	৩০-৩৫
সপ্তম অধ্যায়	উপসংহার	:	৩৬-৩৮
পরিশিষ্ট		:	৩৯-৪২
Select Bibliography		:	৪৩-৪৫

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.০. প্রাক্‌কথন

বৈদিক সংহিতার অন্তর্গত ব্রাহ্মণসাহিত্যে বিবিধ মন্ত্রব্যাখ্যা এবং যাগযজ্ঞ বিষয়ে বর্ণনায় মাঝে মধ্যেই 'নির্বক্তি', 'নিরুক্তি', 'নির্বচন', 'ব্যুৎপত্তি' প্রভৃতি অভিধায় প্রযুক্ত হয়ে প্রাসঙ্গিক নানা শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। এমনকী 'পূর্ব মীমাংসা' সূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী ব্রাহ্মণ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের যে তালিকা প্রদর্শন করেছেন, সেখানেও 'নির্বচন' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে কিন্তু এই নির্বচনগুলির উদ্দেশ্য কী, কোন বিশেষ নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসারে এগুলির প্রণয়ন হয়েছে- সেই বিষয়ে সংহিতাত্মক ব্রাহ্মণ সাহিত্যে স্পষ্ট কোনও রূপরেখা পাওয়া যায়না। আবার পরবর্তীকালে বেদাঙ্গরূপে প্রাপ্ত *নিরুক্ত* নামে একটি নির্বচন শাস্ত্রও প্রণীত হয়। নিরুক্তকার আচার্য যাস্ক সেই গ্রন্থে তিনটি নির্বচন-পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। এই নির্বচন শুধু বেদ-বেদাঙ্গেই সীমাবদ্ধ নেই, তারও অনেক পরে বিভিন্ন বেদ বিষয়ক গ্রন্থে এবং লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যেও তার প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়। অতএব বর্তমান শোধপত্রের মূল লক্ষ্য- ব্রাহ্মণ এবং উত্তরবর্তী সাহিত্যে প্রাপ্ত নির্বচনগুলির অর্থ বিশ্লেষণপূর্বক নির্বচনকৃত শব্দটির উৎস অনুসন্ধান করা এবং যাস্কাচার্যের নির্বচনপদ্ধতি অনুযায়ী নিরুক্তিগুলি পর্যালোচনা করা এবং সুদূর বৈদিক সাহিত্যে প্রাপ্ত নির্বচন ধারা লৌকিকসাহিত্যে অবিকৃতভাবেই ধরা দিয়েছে নাকি অর্বাচীনের স্পর্শে বিকৃত রূপ প্রাপ্ত হয়েছে, সেই বিষয়েও আলোকপাত করা।

১.১. শোধনিবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

শোধপত্রের আকর গ্রন্থ হিসাবে সামবেদসংহিতার অন্তর্গত *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ, কেনোপনিষদ্* ও *ছান্দোগ্যোপনিষদ্-* এই পাঁচটি গ্রন্থ নির্বাচিত হয়েছে। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির মধ্যে নির্বাচিত গ্রন্থগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক। তাই গ্রন্থগুলি আলোচনার আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও যাস্কাচার্য দ্বারা উক্ত নির্বচনের সাথে বৈদিক নির্বচনের তুলনার জন্য নিরুক্ত নামক গ্রন্থটিও গৃহীত হয়েছে। বেদ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে শৌনকাচার্য বিরচিত *বৃহদ্দেবতা,* দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয়ের *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থ, শ্রীমৎ অনির্বাণের *বেদমীমাংসা* গ্রন্থ নির্বাচন করা হয়েছে। *নিরুক্তের* দেবতাধ্যায়ে যেমন বৈদিক দেবতা বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন দেববাচক শব্দের নির্বচন করা হয়েছে তেমনি *বৃহদ্দেবতা* নামক বেদ বিষয়ক প্রকরণগ্রন্থেও অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার একাধিক নামান্তর নির্বচনসহ আলোচিত হয়েছে। সেইজন্য বিষয়বস্তুগত দিক থেকে নিরুক্তের সাথে সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় গ্রন্থটি আলোচ্য শোধপত্রে স্থান পেয়েছে। দয়ানন্দ সরস্বতী এবং শ্রীমৎ অনির্বাণ বেদব্যাখ্যায় নতুন দিগ্-দর্শন করিয়েছেন। তাঁদের অবদানস্বরূপ গ্রন্থদুটিতে বিভিন্ন শব্দের নির্বচন উল্লিখিত হয়েছে। তাই এগুলি আলোচনার আকর হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। লৌকিক সাহিত্যের এক মহামূল্যবান সাহিত্যসম্ভার হল মহর্ষি ব্যাসদেব প্রণীত *মহাভারত*। অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত মহাকাব্যটির অন্তর্গত উদ্যোগপর্ব এবং শান্তিপর্বে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামের নির্বচন দেখা যায়, সেগুলি আলোচ্য শোধপত্রের বিষয়বস্তু।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আচার্য যাস্ক *নিরুক্ত* গ্রন্থে যে নির্বচন-সিদ্ধান্ত বা নির্বচন-ধারার কথা বলেছেন, তদনুসারে সামবেদসংহিতার অন্তর্গত নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত নির্বচনগুলির শব্দার্থ বিশ্লেষণপূর্বক পদ্ধতি নিরূপণের প্রচেষ্টা করা হবে।

তৃতীয়-অধায়ে *সামবেদসংহিতার* অন্তর্গত নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থ যথা-*তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ও কেনোপনিষদ্* নামক বৈদিক গ্রন্থগুলিতে নির্বচনকৃত শব্দগুলি সম্পর্কে যাস্কাচার্য কী নিরুক্তি প্রদর্শন করেছেন, তা উল্লেখ ও অর্থনির্ণয়পূর্বক শব্দগুলির উৎস সন্ধান করতে চাই এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণগুলিতে সেই একই শব্দের নির্বচনগুলিতে প্রাপ্ত ধাতু-প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ উল্লেখ করে তুলনাত্মক বিবরণ প্রস্তুত করাও অপর এক লক্ষ্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনার দুই আকর গ্রন্থ হল শৌনকাচার্য বিরচিত *বৃহদ্দেবতা* নামক ঋগ্বেদীয় বৈদিক দেবতার বর্ণনাশ্রিত গ্রন্থ এবং মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত *মহাভারত। বৃহদ্দেবতায়* বিদ্যমান বৈদিকদেববাচক শব্দগুলির নির্বচনসমূহ অর্থনির্ণয় ও বিশ্লেষণসহ উৎসসন্ধান প্রথম লক্ষ্য। দ্বিতীয়ত *মহাভারতে*র উদ্যোগ এবং শান্তিপর্বে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ নামের নির্বচনগুলি যাস্কাচার্যের নির্বচনসিদ্ধান্তত্রয় অনুসারে পর্যালোচনা করা। বৈদিক নির্বচন লৌকিক সাহিত্যের অঙ্গ হয়েও যাস্কের তিনটি নির্বচন সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিংবা শুধু ব্যাকরণকেই প্রাধান্য প্রদান করে বর্ণিত হয়েছে- সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনার মূল দুই ভিত্তি হল *বেদমীমাংসা* ও *সত্যার্থপ্রকাশ*। *বেদমীমাংসা* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্গভাষায় রচিত দেববাচক শব্দের নির্বচনগুলি অন্তর্গত শব্দসমূহের সাথে সম্পর্কিত সংস্কৃত শব্দ তথা ক্রিয়াপদগুলির সংস্কৃত রূপ বা ধাতুর অনুসন্ধান করে সামগ্রিকভাবে শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা মূল বিবেচ্য। এছাড়াও *সত্যার্থপ্রকাশ* নামক গ্রন্থের প্রথম সমুল্লাসে ব্যাখ্যাত ঈশ্বরের একশত নামের মধ্যে পঞ্চাশটি নাম ব্যাকরণ ও ধ্বনিতাত্ত্বিক উভয় পদ্ধতি অনুসারে ব্যাখ্যা প্রদান কর্মে রত থাকব।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়- *ছান্দোগ্যোপনিষদ্, নিরুক্ত, বৃহদ্দেবতা, মহাভারত, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা ও সত্যার্থপ্রকাশ* -এই গ্রন্থগুলিতে একাধিক দেববাচক শব্দ যেমন - 'অগ্নি', 'আদিত্য', 'জাতবেদাঃ', 'রুদ্র', 'বরুণ', 'বিষ্ণু' ও 'হিরণ্যগর্ভ' এই সাতটি শব্দের নির্বচনগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করে তুলনাত্মক আলোচনার দ্বারা নির্বচনকৃত শব্দগুলির অর্থগত ও পদ্ধতিগত সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য নিরূপণ।

সপ্তম অধ্যায়ে উপসংহার অংশে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বিচার-বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলি ক্রমানুসারে বর্ণিত হবে।

অবশেষে পরিশিষ্ট নামক অংশে একবিংশ শতকের কয়েকজন বেদগবেষকের প্রবন্ধে প্রদর্শিত নির্বচনভাবনার নাতিদীর্ঘ উপস্থাপনা লক্ষিত হবে।

১.২. নির্বচনের ইতিবৃত্ত

'নির্বচন' সম্পর্কে যথাসম্ভব আলোচনার দ্বারা নির্বচন কী, এর নামান্তর, 'নির্বচন' শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হল-

বেদ বা অপৌরুষেয় জ্ঞানরাশিস্বরূপ বৈদিক-সাহিত্য ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপী গঙ্গার অজস্র প্রবাহের মূল স্রোত হিমালয়ের হিমরাশি সদৃশ। বৈদিক ঋষিরা এই অখণ্ড জ্ঞানরাশিকে উপলব্ধি ও আত্মস্থ করে ব্যাখ্যাগ্রন্থরূপে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি রচনা করেন। আরণ্যক উপনিষদ্ এরই অন্তর্গত। বৈদিক আর্ষ-পরম্পরা লোপ হওয়ার পর মন্ত্রার্থ বোধের দিশায় নানাবিধ প্রক্রিয়ার উন্মোচন ঘটে, সেই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যে 'নির্বচন' বা 'নৈরুক্তিক প্রক্রিয়ার' এক বিশেষ স্থান বিদ্যমান। সংহিতায় যে পদ্ধতির বীজ বপন করা হয়েছে তা যুগ যুগান্ত ধরে প্রবহমান ধারায় অব্যাহত থেকে অদ্যাবধি বৈদিক, লৌকিক উভয় সাহিত্যের কাণ্ডারীদের ইষ্ট অর্থ প্রাপ্তির দিশা হিসাবে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ব্যাকরণ প্রক্রিয়া যেমন প্রকৃতি-প্রত্যয় বিশ্লেষণ পূর্বক শব্দের

উৎস সন্ধান ও অর্থ নির্ণয় করে। নির্বচন বা নির্বচনপদ্ধতিও শব্দের অর্থ প্রকাশের সাথে সেই শব্দোৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে পাঠকদের অবগত করে।

১.২.১. নির্বচন ও তার প্রতিশব্দসমূহ

'নির্বচন' শব্দটি 'নির্'-এই উপসর্গ পূর্বক √বচ্-ধাতুর উত্তর 'ল্যুট্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন, যার অর্থ মন্ত্র বা দেবতা বিষয়ক শব্দ সম্পর্কে নিশ্চিত বা নিঃশেষ বা সম্পূর্ণ বচন। যে পদ্ধতিতে শব্দের অর্থ, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পূর্ণরূপে উক্ত হয়, তাকে নির্বচন বলা হয়। *শব্দকল্পদ্রুম* গ্রন্থে 'নির্বচন' শব্দের অর্থ করা হয়েছে- নিরুক্তি, 'নিশ্চয় কথন', 'প্রশংসা' 'নির্গতবচনং যত্র' ইত্যাদি। যাস্কাচার্য বিরচিত *নিরুক্ত* গ্রন্থের বৃত্তিকার দুর্গাচার্য 'নির্বচন' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> অপিহিতস্যার্থস্য পরোক্ষবৃত্তাবতিপরোক্ষবৃত্তৌ বা শব্দে নিষ্কৃষ্য বিগৃহ্য বচনং নির্বচনম্।[১]

অর্থাৎ তাঁর মতানুসারে পরোক্ষবৃত্তি বা অতিপরোক্ষবৃত্তি শব্দের মধ্যে নিহিত বা লুকিয়ে থাকা অর্থকে নিষ্কাসিত করে তৎসম্পর্কিত ব্যুৎপত্তিপরক বচন বা নির্দেশকেই 'নির্বচন' বলা হয়। এটি নির্বচন সংজ্ঞার যৌগিক অর্থ। নির্বচন সংজ্ঞাটি এই পদ্ধতির জ্ঞাপক শাস্ত্রার্থেও রূঢ় বা প্রসিদ্ধ। অতএব পদের মধ্যে নিহিত অর্থের প্রকাশক ব্যুৎপত্তিগত নির্দেশ যে শাস্ত্রে করা হয়েছে, তাকে নির্বচন(শাস্ত্র) বলা হয়। এটি নির্বচন সংজ্ঞার যোগরূঢ় অর্থ। পরবর্তীকালে *অর্থশাস্ত্র*-কার কৌটিল্যাচার্যও 'নির্বচন'-এর লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন-

> গুণতঃ শব্দনিষ্পত্তির্নির্বচনম্।[২]

যদিও প্র. শিবনারায়ণ শাস্ত্রী 'নির্বচন' সংজ্ঞার পদ-পদার্থ-বিশ্লেষণরূপ বচন অর্থাত যৌগিক অর্থে প্রয়োগের প্রমাণ রূপে *দেবতাধ্যায়ব্রাহ্মণের* অন্তর্গত গায়ত্রী, উষ্ণিক প্রভৃতি শব্দের নির্বচনের উল্লেখ করলেও রূঢ়ার্থে অর্থাৎ পদ্ধতির জ্ঞাপক শাস্ত্রার্থে প্রয়োগের কোন প্রমান দেননি। অতএব বলা যায়, 'নির্বচন' শব্দের অর্থ 'নিরুক্তি' অথবা 'বিগ্রহ', যেকোন শব্দের অঙ্গ-উপাঙ্গ বিশ্লেষণ করে তার ব্যুৎপত্তি তথা মূলার্থবোধ (অথবা নিরুক্তি করার) এর প্রক্রিয়া অথবা পদ্ধতির নাম 'নির্বচন'।

নিরুক্তি

'নির্বচন' শব্দের একটি প্রতিশব্দ হল 'নিরুক্তি'। এই শব্দটি 'নির্' উপসর্গ পূর্বক √বচ্-ধাতুর উত্তর 'ক্তিন্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন, যার অর্থ 'নিশ্চিত বা নিঃশেষ উক্তি'। *বাচস্পত্যম্* অনুসারে কোন নির্বচনে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি অবয়বার্থের উল্লেখের দ্বারা সমুচিত অর্থের বোধ হওয়াকেই 'নিরুক্তি' বলা হয়েছে। অতএব 'নিরুক্তি' শব্দের অর্থ 'ব্যুৎপত্তি'। কোন শব্দের ব্যাকরণগত ও ঐতিহাসিক বিকাশ সেই শব্দের নিরুক্তিরই অন্তর্গত। 'নিরুক্তি' শব্দের এই অর্থকে আধার করেই অলঙ্কারশাস্ত্রে 'নিরুক্তি' নামক একটি অলঙ্কারের নামকরণও করা হয়েছে।

নিরুক্ত

এটিও নির্বচন শব্দের একটি পর্যায়বাচী শব্দ। নিরুক্ত শব্দটি নির্ পূর্বক বচ্-ধাতুর সাথে ক্ত-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয়েছে। *শব্দকল্পদ্রুম* অনুসারে- "নির্নিশ্চয়েন উক্তম্"[৩] অর্থাৎ নিশিতরূপে যা উক্ত হয়েছে। এছাড়াও অমরকোষের টীকায় বলা হয়েছে- "বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যযশ্চ ইত্যাদিনা নিশ্চযেনোক্তং নিরুক্তম্"।[৪] হেমচন্দ্র পদবিভাজনকে 'নিরুক্ত' বলেছেন। বাচস্পত্যম্ অনুসারে অর্থকে সম্যকরূপে জ্ঞাপনের জন্য পদের বিভাগকরণকেই 'নিরুক্ত' বলা হয়। *Encyclopedia Britannica* গ্রন্থের ষষ্ঠ খন্ডে শব্দের উৎপত্তি এবং

অর্থের অনুসন্ধানকেই 'নিরুক্ত' বলা হয়েছে অর্থাৎ শব্দের মূল অর্থে পৌঁছানোর মাধ্যম বা পদ্ধতিই হল 'নিরুক্ত'।

ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭/১/২) দেববিদ্যার খ্যাপক ভাষ্যরূপ শাস্ত্রার্থে আচার্য শঙ্কর 'নিরুক্ত' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন।

এছাড়াও *ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকায়* সায়ণাচার্য বলেছেন-

> অর্থাববোধে নিরপেক্ষতয়া পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তম্...তস্মিন্ গ্রন্থে পদার্থাববোধায় পরাপেক্ষা ন বিদ্যতে...তদেতন্নিরুক্তং ত্রিকাণ্ডং ইতি।[৫]

অর্থাৎ শব্দের অর্থবোধের জন্য পদসমূহ যেখানে নিরপেক্ষভাবে উক্ত হয়, সেটি 'নিরুক্ত'। সেই গ্রন্থে অন্য গ্রন্থের সহায়তা ব্যতিরেকেই শব্দের অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে। এই 'নিরুক্ত' গ্রন্থটি ত্রিকাণ্ডাত্মক। 'নিরুক্ত' সংজ্ঞাটি এখানে নিরুক্ত বা নির্বচনপদ্ধতির বোধক শাস্ত্রার্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

অতএব এটা স্পষ্ট যে, পূর্বে 'নিরুক্ত' শব্দটি বেদবিদ্যার খ্যাপক শাস্ত্রার্থে এবং পদ-পদার্থ-বিশ্লেষণকারক বচন অর্থে প্রযুক্ত হত। পরবর্তীকালে এই সংজ্ঞার যৌগিক অর্থের বিস্তার ঘটে পদ-পদার্থ-বিশ্লেষক শাস্ত্রার্থেই রূঢ় বা প্রসিদ্ধ হয়।

এটিমোলোজী (Etymology)

নির্বচন শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'এটিমোলোজী' (Etymology)। 'এটুমন্' (Etumon) ও 'লোগোস্' (Logos) শব্দ দুটি যুক্ত হয়ে 'এটিমোলোজী' (Etymology) শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে, যেটি প্রাচীন গ্রীক শব্দ 'এটুমোলোজিয়া' (Etumologia) থেকে এসেছে। 'এটুমন্' শব্দের অর্থ 'যথার্থ জ্ঞান' (Literal sense of a word) এবং 'লোগোস্' শব্দের অর্থ 'শব্দ' (Word), 'বর্ণনা' (Exaplation)। *কার্লস এন্সাইক্লোপীডিয়া* অনুসারে 'এটিমোলোজি' শব্দের অর্থ "The Science of Truth"[৬]

দি আক্সফোর্ড ডিক্সনরী আফ ইংলিশ এটিমোলোজি (The Oxford Dictionary of English Etymology) তে বলা হয়েছে এটিমোলোজীতে শব্দের উৎপত্তি ও বিকাশ এর অধ্যয়ন করা হয়- "the origin, formation and development (of a word)"।[৭]

অতএব বলা যায় 'নির্বচন' অথবা 'নিরুক্তি' অথবা 'নিরুক্ত' অথবা 'ব্যুৎপত্তি' অথবা 'এটিমালজী' (Etymology) এই শব্দগুলি একটি পদ্ধতিরই নামান্তর এবং শব্দের অর্থকে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করাই এদের বিশেষ উদ্দেশ্য।

১.২.২. নির্বচন শব্দের উৎপত্তি ও প্রয়োগের ক্রমপর্যায়

'নির্বচন' শব্দটি 'নির্' এই উপসর্গ পূর্বক √বচ্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। এটি একটি পদ-পদার্থ বিশ্লেষক পদ্ধতির বোধক। এই শব্দটি বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। প্রয়োগের ঐতিহাসিক ক্রমানুসারে নির্বচন শব্দটির বিকাশের ধারা নিম্নরূপ-

ঋগ্বেদসংহিতায় 'নিরুক্ত' বা 'নির্বচন' শব্দটি সাক্ষাতভাবে প্রযুক্ত হয়নি, তবে একাধিক অংশে 'নিবচন' (নি+√বচ্) পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যার অর্থ 'নিয়মিত বা সংযমিত বচন বা উক্তি'।

অথর্ববেদসংহিতায় 'নিরবোচম্' ক্রিয়াপদ এর প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন-

> যক্ষ্মণাং সর্বেষাং বিষং নিরবোচম্ অহং ত্বত্।[৮]

অর্থাৎ যক্ষ্ম রোগের সকল প্রকার বিষ সম্বন্ধে তোমাকে বলেছি। অতএব 'বলা হয়েছে' -এই অর্থে এখানে 'নিরবোচম্' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দেবতাধ্যায়ব্রাহ্মণের তৃতীয় খণ্ডে প্রথমেই "অথাতো নির্বচনম্"[৯] এইরূপে 'নির্বচন' শব্দটি অবিকৃতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। সেই সঙ্গে পরবর্তী মন্ত্রগুলিতে গায়ত্রী, উষ্ণিক প্রভৃতি মন্ত্রের নির্বচনও করা হয়েছে।

পূর্বমীমাংসা দর্শনের ভাষ্যকার শবরস্বামী তার রচিত *শাবরভাষ্যে* ব্রাহ্মণের যে দশটি আলোচ্য বিষয়ের কথা বলেছেন সেখানে 'নির্বচন' শব্দটি দ্বিতীয় স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। অতএব 'নির্বচন' এই শব্দের বিকাশের পর্যায়ক্রমটি হল-

নিবচনম্ > নিরবোচম্ > নির্বচনম্।

১.২.৩. যাস্কীয় নির্বচনপদ্ধতি

যাস্কাচার্য তাঁর *নিরুক্ত* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈদিক শব্দের নির্বচনের উপায় প্রসঙ্গে ত্রিবিধ মত পোষণ করেছেন, সেগুলি হল-

১. লক্ষণশাস্ত্রানুসারে নির্বচন।

২. লক্ষণশাস্ত্র ব্যতীত বৃত্তিসামান্যের দ্বারা নির্বচন।

৩. লক্ষণশাস্ত্র ব্যতীত অক্ষরবর্ণসামান্যের দ্বারা নির্বচন।

১.২.৩.১ লক্ষণশাস্ত্রানুসারে নির্বচন

যাস্কাচার্য নির্বচনের উপায়স্বরূপ প্রথমেই বলেছেন-

যেষু পদেষু স্বরসংস্কারৌ সমর্থৌ প্রাদেশিকেন গুণেনান্বিতৌ স্যাতাং তথা তানি নির্ব্রূযাত্।[১০]

অর্থাৎ যে সমস্ত পদে স্বর (উদাত্তাদি) ও সংস্কার (প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগে সাধন) লক্ষণশাস্ত্র অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রানুগত নিয়মের অনুগামী, যাদের স্বর ও সংস্কার হতে ধাতু বা ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়, সেই সমস্ত পদের নির্বচন সেইভাবেই অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রের নিয়মানুসারেই করতে হবে। যদিও 'প্রাদেশিকেন গুণেন' এই স্থানে 'প্রাদেশিকেন বিকারেণ' এইরূপ পাঠও দেখা যায়, যেটি স্কন্দস্বামী দ্বারা অনুমোদিত। তিনি 'বিকার' শব্দের অর্থ করেছেন 'ক্রিয়া'। যে সমস্ত পদের উদাত্তাদি স্বর ও ব্যাকরণ পদ্ধতি অনুসারে পরিবর্তন অর্থের অনুকূল হয় এবং ধাতুর সমুচিত ধ্বনি পরিবর্তনের সাথে যুক্ত হয়, তাদের নির্বচন সেইভাবেই অর্থাৎ ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারেই করতে হবে।

অর্থানুকূল ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তিবিশিষ্ট শব্দ 'প্রত্যক্ষবৃত্তি' শব্দ। 'প্রত্যক্ষবৃত্তি' শব্দের নির্বচন ব্যাকরণ পদ্ধতি অনুসারে করতে হবে। ব্যাকরণের সহজ সরল প্রয়োগ এই সমস্ত শব্দের অর্থের নির্বচন করতে সমর্থ হলে তাদের প্রত্যক্ষবৃত্তি নির্বচন বলা হয়। অতএব ব্যাকরণশাস্ত্রের সাথে নির্বচনশাস্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই, একথা বলা যায়না। স্বর-সংস্কার ব্যাকরণ শাস্ত্রে গৌণ হলেও স্বর ও সংস্কারের ধারণাই নির্বচনশাস্ত্রে প্রবেশের ভিত্তি তৈরি করে।

১.২.৩.২ লক্ষণশাস্ত্র ব্যতীত বৃত্তিসামান্যের দ্বারা নির্বচন

এই নির্বচন প্রধানতঃ পরোক্ষবৃত্তি শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই নির্বচন প্রসঙ্গে বলেছেন-

অথানন্বিতেঽর্থেঽপ্রাদেশিকে বিকারেঽর্থনিত্যঃ পরীক্ষেত কেনচিদ্ বৃত্তিসামান্যেন।[১১]

অর্থাৎ, শব্দ যখন অর্থের অনুগামী নয়, যখন ধাতু বা ক্রিয়া অর্থপ্রকাশক নয়, তখন অর্থে নিয়ত থেকে অর্থাৎ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোনও বৃত্তি বা ভাবের সমানতা দ্বারা পরীক্ষা বা নির্বচন করতে হবে।

১.২.৩.৩ লক্ষণশাস্ত্র ব্যতীত অক্ষরবর্ণসামান্যের দ্বারা নির্বচন

'অতিপরোক্ষবৃত্তি' শব্দের নির্বচনের জন্য এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। এটি হল-

> অবিদ্যমানে সামান্যেঽপ্যক্ষরবর্ণসামান্যান্নির্ব্রূয়ান্নত্বেব ন নির্ব্রূয়ান্ন সংস্কারমাদ্রিয়েত।[১২]

অর্থাৎ বৃত্তি বা ভাবের সমানতা না থাকলেও অক্ষর অর্থাৎ স্বর, বর্ণ অর্থাৎ ব্যঞ্জন এদের সমানতা ধরে নির্বচন করবে, কিন্তু নির্বচন যে করবেনা তা নয়, নির্বচন করবেই, ধাতু প্রত্যয় গত সাধন আদর করবেনা।

১.৩. বিবেচনা

অতএব 'নির্বচন' শব্দের উৎপত্তির প্রথম পর্যায় যেমন বৈদিক সংহিতায় লক্ষ্য করা যায় তেমনি নির্বচন বা নির্বচনপদ্ধতির আংশিক প্রয়োগও সংহিতাতেই বিদ্যমান। সশরীরে এবং স্বমহিমায় এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ব্রাহ্মণ সাহিত্যে। তৎকালীন ও তৎপরবর্তী সাহিত্যে নির্বচন শব্দটি 'নিরুক্ত', 'নিরুক্তি', 'ব্যুৎপত্তি' ইত্যাদি প্রতিশব্দেও অভিহিত হয়। শুধু তাই নয়, এটির একটি ইংরেজি নামান্তরও দেওয়া হয়, সেটি হল এটিমলোজি (Etymology)। নিরুক্ত শব্দেরও প্রয়োগ বৈচিত্র্য কম না। কোথাও ক্রিয়াবিশেষণ, কোথাও বা নির্বচন অর্থে আবার কোথাও নিরুক্ত নামক স্বতন্ত্র নির্বচন শাস্ত্র হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে। অতএব এবিষয়ে নিশ্চিত যে, নিরুক্ত শব্দের প্রয়োগবৈচিত্র্যের মতোই একাধিক বৈদিক ও লৌকিক শব্দের বিবিধ অর্থের বাহক হিসাবে বিশ্লেষণ করাই নির্বচনের প্রধান ভূমিকা।

তথ্যপঞ্জি

[১] জ্ঞানপ্রকাশ শাস্ত্রী (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ২/১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৯১।

[২] মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায় (সম্পা.), *কৌটিলীযম্ অর্থশাস্ত্রম্*, পৃষ্ঠা ৪২৯ ।

[৩] *শব্দকল্পদ্রুমঃ, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৯।*

[৪] তত্রৈব।

[৫] শারদা চতুর্বেদী (সম্পা.), *ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকা*, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯৯।

[৬] *কার্লস এন্সাইক্লোপীডিয়া* (খণ্ড-৭), পৃষ্ঠাঙ্ক ৪৬৩।

[৭] *The Oxford Dictionary of English Etymology*, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩২৯।

[৮] *অথর্ববেদসংহিতা* ৯/৮/১০।

[৯] *দেবতাধ্যায়ব্রাহ্মণম্* ৩/১।

[১০] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.) *নিরুক্তম্* ২/১/১/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮২।

[১১] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.) *নিরুক্তম্* ২/১/১/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮৩।

[১২] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.) *নিরুক্তম্* ২/১/১/৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮৪।

***

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত সামবেদীয় ব্রাহ্মণসমূহে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

২.০. ভূমিকা

বেদজ্ঞান ছিল অখন্ড, সমগ্র। পরবর্তীসময়ে ভাসমান অমূল্য ভাবসম্পদকে সুনির্দিষ্টভাবে সংরক্ষণের চিন্তা যখন ঋষিদের মনে উদ্ভাসিত হয় তখন বিষয়বস্তু বা প্রকাশের মাধ্যম অনুযায়ী অখণ্ড বেদকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে সংকলন করা হয়। প্রকাশমাধ্যম অনুযায়ী ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনভাগে সাজানো হল। যেকারণে বেদের অপর নাম ত্রয়ী। এই ত্রয়ীর মধ্যে আমরা *ঋগ্বেদসংহিতা, সামবেদসংহিতা, যজুর্বেদসংহিতা* এবং *অথর্ববেদসংহিতা* এই চার সংহিতাকেই পাই। আবার বিষয়বস্তু অনুযায়ী মূলত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ব্রাহ্মণসাহিত্য। তাই ব্রাহ্মণসাহিত্যকেও পরবর্তীকালে শুদ্ধব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এই বিভাজনকে আরও সরলীকরণ করে বলা যায় যে, মন্ত্রের সংকলনই হল সংহিতা। মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা সহ যাগযজ্ঞের বিবরণ, বিবিধ উপাখ্যান প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণসাহিত্য। অতএব প্রত্যেক সংহিতার অন্তর্গত একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থ বিদ্যমান। আবার কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই ভাগেও বেদের বিভাজন করা হয়। সেক্ষেত্রে মন্ত্র বা সংহিতা এবং শুদ্ধব্রাহ্মণ হল কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত এবং আরণ্যক ও উপনিষদ্ হল জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত।

২.১. ব্রাহ্মণগ্রন্থের লক্ষণসমূহ

ব্রাহ্মণগ্রন্থের লক্ষণ বিষয়ে প্রাচীন আচার্যরা বিবিধ মত পোষণ করেছেন। সূত্রকার আপস্তম্বের মতে- "কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি" [১] অর্থাৎ কর্মের প্রতি প্রেরণাপ্রদানকারী (গ্রন্থগুলি) ব্রাহ্মণগ্রন্থ। পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনি বলেছেন- "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ"[২] অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মনাত্মক বেদের মন্ত্র ব্যতিরিক্ত শেষ অংশই ব্রাহ্মণ। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতানুসারে ব্রাহ্মণের লক্ষণটি হল- "সমানার্থাবেতৌ ব্রহ্মন্ শব্দো ব্রাহ্মণশব্দশ্চ" [৩]। আচার্য দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে- "চতুর্বেদবিদ্ভির্ব্রহ্মভির্ব্রাহ্মণৈর্মহর্ষিভিঃ প্রোক্তানি যানি বেদব্যাখ্যানানি তানি ব্রাহ্মণানি"[৪] অর্থাৎ চতুর্বেদবিদ্ মহর্ষি ব্রাহ্মণগণের উক্ত বা কথিত বেদব্যাখ্যাই ব্রাহ্মণগ্রন্থ নামে পরিচিত।

২.২. সামবেদীয় নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ

সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে তিনটি অন্যতম ও উপলব্ধ শুদ্ধ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হল *প্রৌঢ়* বা *পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ, জৈমিনীয় বা তলবকারব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ* এবং দুটি উপনিষদ্ হল *কেনোপনিষদ্* ও *ছান্দোগ্যোপনিষদ্*। ব্রাহ্মণসাহিত্যের অন্তর্গত এই গ্রন্থগুলি আলোচ্য শোধপ্রবন্ধের আকরস্বরূপ। এগুলি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল-

২.২.১. ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

২.২.১.১. তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ-এ প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

সামবেদীয় ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ*। এই গ্রন্থটি পঁচিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তাই এটি *পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ* নামেও পরিচিত। এই ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞে উদ্গাতৃগেয় স্তোত্র, স্তোম ইত্যাদি বিষয় আলোচনাকালে

মন্ত্রান্তর্গত বিভিন্ন বৈদিক শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। এখানে ৪৫টি শব্দের নির্বচন প্রাপ্ত হয়েছি। নির্বচনগুলি প্রসঙ্গক্রমে পর্যালোচনা করা যাক-

অভিজিৎ

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের ষোড়শ অধ্যায়ের চতুর্থখণ্ডে 'অভিজিৎ', 'বিশ্বজিৎ' ইত্যাদি একাহ সোমযাগে স্তোত্র মন্ত্রের আলোচনাকালে আখ্যায়িকাসহযোগে 'অভিজিৎ' ও 'বিশ্বজিৎ' শব্দের নির্বচন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ পুত্রত্ব অর্জনের পর সবকিছু জয় করতে প্রয়াসী হন। প্রথমে বিশ্ব অর্থাৎ জগৎ জয় করেন। তারপরও যা কিছু অনভিজিত ছিল সেগুলি জয় করতে ইচ্ছুক হন। তখন তিনি অভিজিৎ যজ্ঞের দেখা পান এবং সেই যজ্ঞের দ্বারাই অনভিজিত সব কিছু জয় করেন। অতএব অভিজয়ের সাধনহেতু এই যজ্ঞ 'অভিজিৎ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। নির্বচনটি হল-

সোঽকাময়ত যন্মেঽনভিজিতং তদভিজয়েযমিতি স এতমভিজিতমপশ্যত্তেনানভিজিতমভ্যজযত্।[৫]

অর্থাৎ তিনি (দেবরাজ ইন্দ্র) কামনা করেছিলেন যা কিছু আমার(ইন্দ্রের) অনভিজিত আছে, সেগুলি জয় করতে হবে। তিনি অভিজিৎ যজ্ঞকে দেখেন (এবং) তার দ্বারা অবিজিত সমস্তকিছু জয় করেন।

এই গ্রন্থের বিংশতম অধ্যায়েও অভিজিদতিরাত্র নামক যজ্ঞের স্তোত্রের অধিকারি বর্ণনা কালেও অভিজিৎ শব্দের নির্বচন করা হয়েছে, সেটি হল-

অভিজিতা বৈ দেবা অসুরান্ ইমান্ লোকানভ্যজযন্।[৬]

অর্থাৎ অভিজিৎ যজ্ঞ দ্বারা দেবতারা অসুরদের ও লোকসমূহ (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক) জয় করেছিলেন।

বাইসতম অধ্যায়ে 'অভিজিৎ', 'বিশ্বজিৎ' ইত্যাদি নামক পাঁচদিন সাধ্য 'অতিরাত্র' যজ্ঞবিষয়ে আলোচনাকালে উক্ত পাঁচদিনের প্রশংসা করেছেন। যজ্ঞ চলাকালীন কোন মাসের চতুর্দশতম দিনকে 'অভিজিৎ' (দিবস) নামে অভিহিত করা হয়। অভিজিৎ দিনের প্রশংসাকালে বলা হয়েছে-

অভিজিতা বৈ দেবা ইমান্ লোকানভ্যজযন্।[৭]

অর্থাৎ অভিজিৎ দিবসে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ দ্বারা দেবতারা এই লোকসমূহ (পৃথিব্যাদি ত্রিলোক) জয় করেছিলেন।

নির্বচনপদ্ধতি

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে অভিজিৎ শব্দের নির্বচনটি একাধিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও একই ক্রিয়াপদের দ্বারাই নিরুক্তি করা হয়েছে। এটি একটি 'অসমস্ত-শব্দার্থ-নির্বচন' বলা যায়। এখানে তিনটি নির্বচনেই অভিজিৎ শব্দটি 'অভ্যজযৎ' ও তার বহুবচন 'অভ্যজযন্' এই ক্রিয়াপদের নিরিখে প্রদর্শিত হয়েছে অর্থাৎ 'অভি' এই উপসর্গ পূর্বক *জি জয়ে* ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে অভিজিৎ পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যেহেতু দেবরাজ ইন্দ্রের যা কিছু অবিজিত ছিল তার অভিমুখী হয়ে জয়লাভ করেছিলেন বা দেবতারা অসুরদের ও ত্রিলোকের অভিমুখে লক্ষীভূত হয়ে অভিজিতের দ্বারাই তাদের জয় করেছিলেন তাই 'অভিজিৎ' এই নাম সিদ্ধ হয়।

পাণিনীয়ব্যাকরণ অনুসারে 'অভিজিৎ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল- 'অভিমুখীভূয় জযতি (শত্রূন্)' এই অর্থে অভি এই উপসর্গ পূর্বক *জি জয়ে* ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'অভিজিৎ' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে (অভি - *জি জয়ে* + 'ক্বিপ্')। এখানে প্রাসঙ্গিক সূত্রটি হল- "সৎসূদ্বিষদ্রুহযুজবিদভিদচ্ছিদজিনীরাজামুপসর্গেঽপি ক্বিপ্"[৮] অর্থাৎ পাণিনীয় ব্যাকরণেও অভিজিৎ শব্দটি অভিমুখীকৃত হয়ে জয় করা অর্থে, জয়ার্থক √জি ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন

হয়েছে। তাই বলা যায়, বৈয়াকরণ শব্দগঠনপ্রক্রিয়া অনুসারেই *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে* 'অভিজিৎ' শব্দের নির্বচনগুলি সিদ্ধান্তিত হয়েছে। 'অভিজিৎ' এই মূল শব্দের সাথে উৎস স্বরূপ ধাতু (*জি জয়ে*) বা ক্রিয়াপদের (অভ্যজযত্) ধ্বনি ও অর্থগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। অতএব ব্যাকরণের সহজ-সরল প্রয়োগ দ্বারাই নির্বচনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যাস্কাচার্যের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে* উল্লেখিত 'অভিজিৎ শব্দের নির্বচনটি প্রত্যক্ষবৃত্তি শব্দের নির্বচন বা প্রত্যক্ষ নির্বচন শ্রেণীর অন্তর্গত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

আজ্য (পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতি), গৌঙ্গব (অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতি) ইত্যাদি।

২.২.১.২. *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ*-এ প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

বায়ু

জৈমিনীয়ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় কাণ্ডে বলা হয়েছে পুরুষই প্রজাপতি, প্রজাপতি আবার সংবৎসর। এই পুরুষই আবার অন্তরিক্ষ রূপ আকাশ। এই অন্তরিক্ষকেই আবার 'বায়ু' ও 'বাত' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে এবং সেখানেই অন্তরিক্ষের অন্তরিক্ষত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, ও বাত শব্দের বাতত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'বায়ু' শব্দটি যেভাবে নির্বচিত হয়েছে তা হল-

> যদিদং সর্বং যুতে তস্মাদ্ বায়ুঃ।[৯]

অর্থাৎ যেহেতু এই অন্তরিক্ষ সবকিছুকে যুক্ত করে, তাই এটি বায়ু নামে পরিচিত।

নির্বচনপদ্ধতি

'বায়ু' শব্দের নির্বচনে 'যুতে' এই ক্রিয়াপদ থেকে অনুমান করা যায়, √যু-ধাতু (*যু মিশ্রণেঽভিমিশ্রণে চ*, অদাদিগণ, পানিনীয়ধাতুপাঠ ১০৩৩) থেকে 'বায়ু' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাকরণ অনুসারে 'বায়ু' শব্দটি 'কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্' (উণাদিসূত্র. ১/১) সূত্র দ্বারা 'বা'-ধাতুর সাথে 'উণ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উৎপন্ন হয় (√বা-ধাতু + উণ্ প্রত্যয় = বায়ু)। এখানে উল্লেখ্য যে √যু-ধাতুর সাথে 'বায়ু' শব্দের অন্ত্যবর্ণ 'যু' এর বর্ণাক্ষরগত সাম্য লক্ষ্য করা যায় (√যু ধাতু > বায়ু)। অতএব বলা যায়, বায়ু শব্দের নির্বচনটি যাস্কীয় অতিপরোক্ষনির্বচন শ্রেণির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ।

সঞ্জয় (প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতি), ঋক্ (পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতি) ব্রহ্ম (পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতি) ইত্যাদি।

২.২.১.৩. *জৈমিনীয়োপনিষদ্‌ব্রাহ্মণ*-এ প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

আদিত্য

প্রাণসমূহকে আদিত্য সংজ্ঞা দেওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে-

> প্রাণা বা আদিত্যাঃ। প্রাণা হীদং সর্বমাদদতে।[১০]

অর্থাৎ প্রাণসমূহই আদিত্য কারণ প্রাণসমূহই এই সবকিছু আদান বা গ্রহণ করেন।

নির্বচনপদ্ধতি

নির্বচনটির বিশ্লেষণ থেকে অনুমান করা যায় যে, 'আদদতে' ক্রিয়াপদটি 'আদিত্য' শব্দের উৎপত্তির কারণ। অর্থাৎ 'আ' এই উপসর্গ √দা-ধাতু (*ডু দাঞ্ দানে,* জুহোত্যাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৯১) থেকে 'আদিত্য' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে। সবকিছু আদান বা গ্রহণ করেন বলেই আদিত্য। যদিও ব্যাকরণ অনুসারে 'অদিতির

পুত্র’ এই অর্থে ‘অদিতের্ঞ্য’ সূত্র দ্বারা ‘অদিতি’ শব্দের সাথে ‘ঞ্য’ প্রত্যয় যুক্ত করে ‘আদিত্য’ শব্দটি গঠিত হয়। অতএব অনুমান করা যায় পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে আদিত্য শব্দটির নির্বচন করা হয়েছে।

গায়ত্র (অতিপরোক্ষনির্বচন), হরি (প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতি) ইত্যাদি।

২.২.১.৪. *কেনোপনিষদ্-এ* প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

কেনোপনিষদ্ সামবেদীয় ব্রাহ্মণসাহিত্যের অন্তর্গত একটি উপনিষদ্ গ্রন্থ। গ্রন্থটি চারটি খণ্ডে বিভক্ত। *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ-*এর সপ্তম অধ্যায় বা *উপনিষদ্ব্রাহ্মণ-*এর চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ থেকে একবিংশ খণ্ড পর্যন্ত অংশ নিয়ে বিরাজিত। এখানে ব্রহ্ম বিষয়ে বিবৃতি প্রদান ও তাঁকে লাভ করার উপায় বর্ণনাকালে তিনি ‘তদ্বনম্’ এই অভিধায় ভূষিত হয়েছেন।

এই উপনিষদে কেবলমাত্র ‘তদ্বনম্’ বা ‘তদ্বন’ শব্দের নির্বচন লক্ষ্য করা যায়, সেটি হল-

> তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং বেদাঽভিহৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি।[১১]

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম অবশ্যই প্রাণিবর্গের সম্ভজনীয় (তদ্বন) এই নামধারী, অতএব প্রাণিগণ কর্তৃক সম্ভজনীয়রূপেই উপাস্য। যে কেউ এই ব্রহ্মকে এইরূপে উপাসনা করেন তাঁকে সকল ভূতবর্গ অবশ্যই পার্থনা করে থাকেন।

নির্বচনপদ্ধতি

‘তদ্বনম্’ শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য বলেছেন – “তদ্ ব্রহ্ম হ কিল তদ্বন নাম তস্য বনং তদ্বনং তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতত্বাদ্বনং বননীযং সম্ভজনীযম্। অতঃ তদ্বং নাম”।[১২]

অতএব বলা যায় ‘তদ্বন’ শব্দের উৎপত্তি ব্যাকরণ অনুসারেই সিদ্ধ হয়েছে। ‘তস্য বনম্ তদ্বনম্’- এইরূপ বিগ্রহবাক্য দ্বারা পদটি সিদ্ধ হয়। তাই বলা যায় প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নিরুক্তি করা হয়েছে।

২.২.১.৫ *ছান্দোগ্যোপনিষদ্-এ* প্রাপ্ত নির্বচনপদ্ধতি

সামবেদসংহিতার অন্তর্গত এই উপনিষদে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ, আখ্যান ইত্যাদি বর্ণনার মধ্যেই বিভিন্ন শব্দের অর্থপ্রদানস্বরূপ একাধিক নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে, সেগুলি ক্রমান্বয়ে বিশ্লেষণ করে আচার্য যাস্কের নির্বচনসিদ্ধান্তের প্রয়োগ বর্ণিত হল-

উদ্গীথ

ব্যানরূপে উদ্গীথের উপাসনা বর্ণনার পর উদ্গীথের অক্ষরসমূহের উপাসনার কথা বলা হয়েছে। সেখানে প্রাণ, বাক্য ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হয়েছে। এখানেই নির্বচনটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সেটি হল-

> অথ খলূদ্গীথাক্ষরাণ্যুপাসীতোদ্গীথ ইতি প্রাণ এবোৎপ্রাণেন হ্যুত্তিষ্ঠতি বাগ্গীর্বাচো হ গির ইত্যাচক্ষতেঽন্নং থমন্নে হীদং সর্বং স্থিতম্।[১৩]

তারপর উদ্গীথের নামের অক্ষরসকলকে অর্থাৎ ‘উত্’, ‘গী’ ও ‘থ’ এই অক্ষরতিনটিকে উপাসনা করবে। প্রাণই ‘উত্’ কারণ প্রাণসহায়েই লোক উত্থিত হয়। বাক্যই ‘গী’ কারণ বাক্যসমূহকে ‘গী’ নামে অভিহিত করা হয়। অন্নই ‘থ’ কারণ অন্নাবলম্বনেই এই সমস্ত স্থিতি লাভ করে।

নির্বচনপদ্ধতি

'উদ্গীথ' শব্দের অন্তর্গত 'উত্', 'গী' এবং 'থ' এই অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। যেমন 'উত্' এই আদ্যংশটি উত্তিষ্ঠতি এই ক্রিয়াপদ থেকে নেওয়া হয়েছে, 'গী' এই মধ্যাংশটি 'গির' শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে এবং 'থ' এই অন্তিমাংশ 'স্থিত' অর্থাৎ 'স্থা' ধাতু থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশেষে এগুলি সংযুক্ত হয়ে উদ্গীথ শব্দ উৎপন্ন হয়। অতএব অতিপরোক্ষনির্বচন পদ্ধতিতে নির্বচন করা হয়েছে।

> দৌরেবোদন্তরিক্ষং গীঃ পৃথিবী থমাদিত্য এবোদ্বায়ুর্গীরগ্নিস্থম্য সামবেদ এবোদ্যজুর্বেদো গী ঋগ্বেদোস্থং দুগ্ধেস্মৈ বাগ্দোহং যো বাচো দোহো...।[১৪]

অর্থাৎ দ্যুলোক হল 'উত্', অন্তরিক্ষ 'গী', পৃথিবীই 'থম্', আদিত্যই 'উত্', বায়ুই 'গী', এবং অগ্নিই 'থম্', সামবেদ 'উত্', যজুর্বেদ 'গী', ঋগবেদ 'থম্'।

নির্বচনপদ্ধতি

শঙ্করাচার্যের উক্তি অনুযায়ী এখানেও উদ্গীথ শব্দের 'উত্' যথাক্রমে 'উচ্চৈঃ' এবং 'ঊর্ধ্ব' শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে, 'গী' অংশটি তিনটি ক্ষেত্রেই √গৃ-ধাতু নিষ্পন্ন 'গিরণ' ক্রিয়াপদ থেকে এবং 'থ' √স্থা-ধাতু থেকে নেওয়া হয়েছে। অতএব এখানেও 'উদ্গীথ' শব্দটি অতিপরোক্ষনির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচিত হয়েছে।

আযাস্য (পরোক্ষনির্বচনপদ্ধতি), প্রতিহার (প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতি) ইত্যাদি।

২.৩. উপসংহার

আচার্য যাস্ক নির্দেশিত নির্বচন-সিদ্ধান্ত বা নির্বচনপদ্ধতি অনুসারে নির্বচনগুলির শব্দার্থ বিশ্লেষণপূর্বক পদ্ধতি নিরূপণের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ জানা যায়, *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ* প্রভৃতি সামবেদীয় নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে যাজ্ঞিক বর্ণনা ও তত্ত্বচিন্তার আধারে প্রদর্শিত নির্বচনগুলির নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত কোনো রূপরেখার উল্লেখ না থাকলেও তা যাস্কাচার্য দ্বারা উক্ত নির্বচন-সিদ্ধান্তকে (অনেকাংশেই) অনুসরণ করেছে এবং বিবিধ অর্থপ্রদানকারী নির্বচনগুলি পদ্ধতিগত দিক থেকেও যথার্থ। যাস্কাচার্যকৃত নির্বচন-পদ্ধতি এইসমস্ত নির্বচনগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষার-ই ফলস্বরূপ।

তথ্যপঞ্জি

---

[১] *আপস্তম্বযজ্ঞপরিভাষাসূত্রম্* ১/৩৫।
[২] *পূর্বমীমাংসাসূত্রম্* ২/১/৩৩।
[৩] *মহাভাষ্যম্* ৫/১/১/৭।
[৪] সতীশ চন্দ্র মণ্ডল (অনু.), *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা,* পৃষ্ঠাঙ্ক ১০৩।
[৫] *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণম্, দ্বিতীয়ভাগঃ* ১৬/৪/৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৮২।
[৬] *তদেব* ২০/৮/১, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৫০।
[৭] *তদেব* ২২/৮/৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৬৬৪।
[৮] *অষ্টাধ্যায়ীসূত্রপাঠঃ* ৩/২/৬১।
[৯] রঘুবীর এবং লোকেশ চন্দ্র (সম্পা.), *জৈমিনীয়ব্রাহ্মণম্* ২/৫৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮০।
[১০] ভগবদ্দত্ত (সম্পা.), *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণম্* ৪/২/৯, পৃষ্ঠাঙ্ক ১২৯।
[১১] গম্ভীরানন্দ (সম্পা.), *কেনোপনিষদ্ (উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী)* ৪/৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৪০।
[১২] তত্রৈব।

[13] *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* (গীতাপ্রেস, গোরখপুর সংস্করণ) ১/৩/৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭০।
[14] *তদেব* ১/৩/৭, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭২।

***

তৃতীয় অধ্যায়

নিরুক্তে প্রাপ্ত সামবেদীয় শব্দসমূহের নির্বচন

৩.০. ভূমিকা

*নিরুক্ত*শাস্ত্র মূলত নিঘণ্টুর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ। তথাপি যাস্কাচার্য তাঁর নিরুক্তগ্রন্থে ১৭৭০ টি শব্দের মধ্যে ৫৮৫টি শব্দ *নিঘণ্টু* থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং অবশিষ্ট ৫৮৭টি শব্দ তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ। দুর্বোধ্যভাষাময় বৈদিক সাহিত্যে নির্বিঘ্ন অবগাহনের এক অন্যতম সহায়ক গ্রন্থ হল *নিরুক্ত*শাস্ত্র। এই গ্রন্থটি তিনটি কাণ্ড ও পরিশিষ্ট অংশ বাদ দিয়ে বারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। তিনটি কাণ্ড যথাক্রমে নৈঘণ্টুককাণ্ড, নৈগমকাণ্ড এবং দৈবতকাণ্ড। নৈঘণ্টুক কাণ্ড প্রথম তিনটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত। এই কাণ্ডে, ব্যাকরণ ও নিরুক্তের সম্বন্ধ এবং সমানার্থক শব্দের অর্থাৎ পৃথিব্যাদিবাচক অনেক শব্দের একার্থত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত নৈগমকাণ্ড। এখানে একটি শব্দের অনেকার্থত্ব প্রদর্শিত হয়েছে এছাড়াও অনবগতসংস্কার শব্দের নিরুক্তিসাধনও লক্ষ্য করা যায়। দৈবতকাণ্ড সপ্তম অধ্যায় থেকে দ্বাদশ অধায় পর্যন্ত অংশ নিয়ে বিদ্যমান। এখানে দেবতার স্তুতি বিষয়ক পদসমূহ আলোচিত হয়েছে। তিন প্রকার দেবতা, তাঁদের স্বরূপ এবং স্তুতিপরক মন্ত্রের ভেদ স্থান পেয়েছে। *নিরুক্ত*গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত নির্বচনসিদ্ধান্ত নির্বচনশাস্ত্রের ইতিহাসে এক অনন্য সৃষ্টি। যা অবলম্বন করে বৈদিক ও লৌকিক উভয় শব্দের বর্গীকরণ, উৎপত্তি ও অর্থ বিষয়ে সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায় এবং অনুমানও করা হয় যে, তাঁর নির্বচনপদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে বৈদিকনির্বচন পদ্ধতিরই লিখিত স্বরূপমাত্র।

৩.১. নির্বচনসমূহের তুলনা

যাস্ককৃত *নিরুক্তে* অনেক বৈদিক শব্দের নির্বচন করা হয়েছে যেগুলি বিভিন্ন বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও তদন্তর্গত উপনিষদেও তৎকালীন ঘটনা ও বিষয়ের পরিপেক্ষিতে বর্ণিত ও নির্বচিত হয়েছে। যেমন দেখা যায়, সামবেদীয় কিছু নির্বাচিত গ্রন্থ- *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষদ্* প্রভৃতিতে এমন কিছু শব্দের নির্বচন বিদ্যমান যেগুলির যাস্কাচার্যকৃত *নিরুক্তেও* নির্বচন করা হয়েছে। যাস্ককৃত একই বৈদিক শব্দের নির্বচনগত বিশ্লেষণপূর্বক সেগুলির তুলনাত্মক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক-

অন্তরিক্ষ

‘অন্তরিক্ষ’ বলতে সাধারণত আকাশ বা অন্তরিক্ষলোককে বোঝায়। ‘অন্তরিক্ষ’ শব্দটি সামবেদীয় *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* যেমন নির্বচিত হয়েছে ঠিক তেমনি যাস্কাচার্যও তাঁর গ্রন্থে শব্দটিকে নির্বচিত করেছেন।

যাস্ক *নিরুক্তের* দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ষোড়শ অন্তরিক্ষবাচক শব্দের নির্বচনকালে প্রথমেই ‘অন্তরিক্ষ’ শব্দের নির্বচন করেছেন। প্রশ্নোত্তরের আঙ্গিকে প্রদর্শিত নির্বচনটি হল-

> অন্তরিক্ষং কস্মাত্?।। অন্তরা ক্ষান্তং ভবতি। অন্তরেমে (ক্ষিযতি) ইতি বা।। শরীরেষ্বন্তরক্ষযমিতি বা।।[১]

‘অন্তরিক্ষ’ নাম কোথা থেকে হল, তার উত্তরে বলা হয়েছে, দ্যুলোক এবং পৃথিবী এই উভয়লোকের অন্তরা বা মধ্যবর্তী হওয়ায় এবং পৃথিবী শেষ সীমা যার এরকম হওয়ায় অথবা দ্যুলোক এবং পৃথিবী এই উভয়

স্থানের মধ্যে নিবাস করায় অথবা শরীরসমূহের মধ্যে অবস্থিত এবং অক্ষয় হওয়ায় ‘অন্তরিক্ষ’ এই নাম হয়েছে।

বিমর্শ

‘অন্তরিক্ষ’ শব্দের নির্বচনে তিনটি হেতুর উল্লেখ করে শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম কারণ অনুসারে ‘অন্তরিক্ষ’ শব্দের উৎপত্তিতে ‘অন্তরা’ ও ‘ক্ষান্ত’ শব্দদুটির বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান অর্থাৎ ‘অন্তরা’ শব্দটি √ক্ষম্-ধাতুর (*ক্ষমূষ্ সহনে* , ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৪৪২) সাথে যুক্ত হয়ে শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ‘অন্তরা’ শব্দের সাথে √ক্ষি-ধাতুর (*ক্ষি নিবাসগত্যো,* তুদাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৪০৭) সংযোগে ‘অন্তরিক্ষ’ শব্দটি সিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, অন্তর্ + ন + √ক্ষি-ধাতু (ক্ষি ক্ষয়ে, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ২৩৬) যুক্ত হয়ে ‘অন্তরিক্ষ’ শব্দের সিদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে* ‘অন্তরিক্ষ’ শব্দটি ‘অন্তর্’ শব্দ থেকে নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হয়েছে (অন্তর্ > অন্তরিক্ষ)। শুধু তাই নয়, *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* ‘অন্তর্যক্ষ’ শব্দ থেকে ‘অন্তরিক্ষ’ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ ‘অন্তর্ যক্ষ’ > ‘অন্তরিক্ষ’ (যকারের স্থানে ইকার হয়েছে ধ্বনিপরিবর্তনের মাধ্যমে)।

অতএব বলা যায় ‘অন্তরিক্ষ’ শব্দটির আকাশ বা অন্তরিক্ষ অর্থে সামবেদীয় দুই ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও *নিরুক্তে* নির্বচন করা হলেও সর্বত্রই শব্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেগুলি দ্বারা শব্দটির নানাবিধ সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ	অন্তর্ > অন্তরিক্ষ।
জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	অন্তর্যক্ষ > অন্তরিক্ষ।
নিরুক্ত	অন্তরা + √ক্ষম্-ধাতু = অন্তরিক্ষ।
	অন্তরা + √ক্ষি-ধাতু = অন্তরিক্ষ।
	অন্তর্ + ন + √ক্ষি-ধাতু ধাতু = অন্তরিক্ষ।

অসুর

সামবেদীয় *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* বিদ্যমান ‘অসুর’ শব্দের নির্বচন *নিরুক্তেও* করা হয়েছে।

নিরুক্তের একাধিক স্থানে ‘অসুর’ শব্দের নির্বচন করা হয়েছে। প্রথমটি হল-

> অসুরা অসুরতা স্থানেষ্বস্তা স্থানেভ্য ইতি বাপি বাসুরিতি প্রাণনামাস্তঃ শরীরে ভবতি তেন তদ্বন্তঃ।।[২]

অর্থাৎ অসুররা তাদের স্থানগুলিতে সুষ্ঠুভাবে রত থাকে না অথবা তাদের স্থানসমূহ থেকে নিক্ষিপ্ত বা স্থানচ্যুত হয়। অথবা অসু এটি প্রাণের নাম, (যা) শরীরে নিক্ষিপ্ত বা অবস্থিত হয়। তার দ্বারাই প্রাণবান্ বা প্রাণবিশিষ্ট হওয়ায় ‘অসুর’ এই সংজ্ঞা।

দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

> অসুরত্বম্ প্রজ্ঞাবত্ত্বং বাহনবত্ত্বং বাপি বা। অসুরিতি প্রজ্ঞানাম্, অস্যত্যনর্থান্ অস্তাশ্চাস্যামর্থাঃ। অসুরত্বমাদিলুপ্তম্[৩]।

অর্থাৎ অসুরত্ব শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাবত্ব বা প্রাণবত্ব কারণ অসু শব্দ প্রজ্ঞাবাচক, যা অনর্থসমূহকে বিনাশ করে, এতে (প্রজ্ঞায়) ধনসমূহ বা পুরুষার্থ অস্ত বা নিহিত থাকে। অসু শব্দ প্রাণবাচক, যার উপস্থিতিতে বা যার দ্বারা এই সমস্তই করা সম্ভব। 'অসুরত্ব' শব্দটি আদিলোপের দ্বারা সৃষ্ট।

বিমর্শ

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাপ্ত নির্বচনে প্রথমে 'অসুরতা' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করে প্রথম হেতু হিসাবে 'অ-সুরতা' অর্থাৎ 'নঞ্ (অ) সু- রতা' এরকম বিগ্রহ পাওয়া যায়। তদনুসারে 'নঞ্ + সু + √রম্-ধাতু থেকে 'অসুর' শব্দের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণস্বরূপ বলা হয়েছে- 'স্থানেভ্যঃ স্বস্তা' অর্থাৎ স্থানচ্যুত বা নিক্ষিপ্ত। এর দ্বারা √অস্-ধাতুর (*অসু ক্ষেপণে,* দিবাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১২০৯) ধাতুর উত্তর উণাদি 'উরন্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'অসুর' শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়েছে এবং তৃতীয় কারণ হল- অসুমান অর্থাৎ প্রাণবান হওয়ায় 'অসুর' অর্থাৎ 'অসু' শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয় যুক্ত করে 'অসুর' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে প্রাপ্ত নির্বচন অনুসারে প্রথমত, প্রজ্ঞা ও প্রাণের বাচক 'অসু' শব্দের সাথে মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয় যুক্ত করে 'অসুর' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। দ্বিতীয় প্রসঙ্গে দুর্গাচার্যের উক্তি হল- "যদেতদসুরত্বং তদ্বসুরত্বং সদাদিবর্ণলোপেনাভিসংপন্নং জানীযাত্" [৪] অর্থাৎ 'বসুর' ('বসু' + 'র' প্রত্যয়, উদকবান) শব্দের 'ব'কার লোপ করে 'অসুর' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে।

পরন্তু *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণে* 'অসু' শব্দের সাথে √রম্-ধাতু যুক্ত করে 'অসুর' শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। এই ব্রাহ্মণগ্রন্থে মনকে 'অসুর' বলা হয়েছে কারণ মন 'অসু' অর্থাৎ প্রাণে রমণ করে। কিন্তু *নিরুক্তে* দেবতাদের শত্রু তথা রাক্ষস এবং দেবতা (উদকবান, প্রজ্ঞাবান অর্থে) উভয় অর্থেই 'অসুর' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে।

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	অসু + √রম্-ধাতু = অসুর
নিরুক্ত	নঞ্ + সু + √রম্-ধাতু = অসুর
	√অস্-ধাতু + 'উরণ্' প্রত্যয় (উণাদি প্রত্যয়) = অসুর
	অসু + 'র' প্রত্যয় (মত্বর্থীয়) = অসুর
	বসু + 'র' প্রত্যয় = বসুর > অসুর (ব্ এর লোপ)

আদিত্য

'আদিত্য' শব্দের নির্বচন *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ও *নিরুক্তে* দৃষ্ট হয়।

নিরুক্ত অনুসারে 'আদিত্য' শব্দের নির্বচন হল-

> আদিত্যঃ কস্মাত্ ? আদত্তে রসান্ আদত্তে ভাসং জ্যোতিষাম্। আদীপ্তো ভাসেতি বা। অদিতেঃ পুত্র ইতি বা।[৫]

অর্থাৎ আদিত্য নাম কোথা থেকে এল, তার উত্তরে বলা হয়েছে, (যা) রস গ্রহণ করে, জ্যোতিষ্মান পদার্থের জ্যোতি বা দীপ্তি গ্রহণ করে, অথবা স্বকীয় দীপ্তিতে আবৃত অথবা অদিতির পুত্র।

বিমর্শ

'আদত্তে' ও 'আদীপ্ত' এই দুই ক্রিয়াপদ থেকে যথাক্রমে 'আ' এই উপসর্গপূর্বক দানার্থক √দা ধাতু (*ডু দাঞ্ দানে,* জুহোত্যাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৯১) থেকে এবং আ এই উপসর্গ পূর্বক √দীপ্ (*দীপী দীপ্তৌ,* দিবাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১১৫০) ধাতু থেকে 'আদিত্য' শব্দ নিষ্পন্ন হয় এবং অদিতির পুত্র হিসাবে অদিতি শব্দের সাথে অপত্যর্থক 'ঞ্য' প্রত্য যুক্ত করে 'আদিত্য' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়।

কিন্তু *জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষদে* 'আ' এই উপসর্গপূর্বক দানার্থক √দা ধাতু (*ডু দাঞ্ দানে,* জুহোত্যাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৯১) থেকে 'আদিত্য' শব্দ উৎপন্ন হয়েছে।

জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ	আ-√দা-ধাতু > আদিত্য
ছান্দোগ্যোপনিষদ্	আ-√দা-ধাতু > আদিত্য
নিরুক্ত	আ-√দা-ধাতু > আদিত্য। আ-√দীপ্-ধাতু > আদিত্য। অদিতি > আদিত্য

গায়ত্রী

সামবেদান্তর্গত *ছান্দোগ্যোপনিষদে* যে 'গায়ত্রী' শব্দের নির্বচন করা হয়েছে, তা আচার্য যাস্ক দ্বারাও নির্বচিত হয়েছে।

আচার্য যাস্ক কর্তৃক নির্বচনটি হল-

গাযত্রী গাযতেঃ স্তুতিকর্মণঃ। ত্রিগমনা বা বিপরীতা গাযতো মুখাদুদপতদিতি চ ব্রাহ্মণম্।[৬]

অর্থাৎ 'গায়ত্রী' শব্দটি স্তুত্যর্থক √গৈ-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে অথবা 'গায়ত্রী' ত্রিগমনা তিনটি পাদবিশিষ্টা, এই 'ত্রিগম' শব্দই অক্ষর বিপর্যয়ের দ্বারা 'গায়ত্রী' শব্দে পরিণত হয়েছে। ব্রাহ্মণসাহিত্যে বলা হয়েছে স্তুতিকালীন ব্রহ্মার মুখ থেকে পতিত হয়েছিল তাই 'গায়ত্রী' সংজ্ঞা হয়েছে।

বিমর্শ

'গায়ত্রী' শব্দের নির্বচন থেকে তিনটি উপায়ে শব্দটি সিদ্ধ করা হয়েছে। প্রথমত, স্তুত্যর্থক √গৈ-ধাতুর সাথে 'অত্রিন্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'আয়' আদেশ হয়ে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ প্রত্যয় যুক্ত করে সিদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ত্রিগম > ত্রিগায় > গায়ত্রী। তৃতীয়ত, √গৈ-ধাতু (*গৈ শব্দে,* ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৯১৮) ও √পত্ ধাতু (*পত্ঌ পালনে,* ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৮৪৫) যোগে 'গায়ত্রী' শব্দ ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে। *ছান্দোগ্যোপনিষদে* √গৈ-ধাতুনিষ্পন্ন 'গায়তি' থেকে 'গায়' অংশ এবং √ত্রৈ ধাতু (*ত্রৈঙ্ পালনে,* ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৯৬৫) থেকে জাত 'ত্রায়তে' থেকে 'ত্র' গৃহীত হয়ে 'গায়ত্র' শব্দ উৎপন্ন হয়। তারপর অন্ত্যস্বর অকারের দীর্ঘ-ঈকারে পরিবর্তন করে 'গায়ত্রী' রূপটি পাওয়া যায়।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ –	√গৈ-ধাতু + √ত্রৈ-ধাতু > গায়ত্র > গায়ত্রী।
নিরুক্ত	√গৈ-ধাতু + অত্রিন্ প্রত্যয় = গায়ত্রি ('আয়' আদেশ) > গায়ত্রী (স্ত্রীলিঙ্গ 'ঙীষ্')। ত্রিগম > ত্রিগায় > গায়ত্রী (অক্ষরবৈপরীত্য), (স্ত্রীলিঙ্গ 'ঙীষ্' প্রত্যয়)।

	গাপত্র > গায়ত্র > গায়ত্রী।

৩.২. উপসংহার

সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে জানা যায়, নিরুক্তকার শব্দের উৎপত্তিতে কখনও একটি ব্রাহ্মণগ্রন্থের সাথে, কখনও বা একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। আবার একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও *নিরুক্তে* একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (যেমন অন্তরিক্ষ শব্দ)। পুনরায় কোন স্থানে ব্রাহ্মণগ্রন্থকে অনুসরণ করলেও তদতিরিক্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যুৎপত্তিরও সন্ধান দিয়েছেন। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে যাস্কাচার্য একই শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তির সাথে তদ্ভিন্ন অর্থের দ্যোতক হিসাবে ভিন্ন ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শন করেছেন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'আদিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি। অতএব বলা যায় আচার্য যাস্ক বৈদিক নির্বচন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু সর্বত্র অন্ধভাবে গ্রহণ না করে নিজ স্বতন্ত্র মহিমারও পরিচয় দিয়েছেন।

তথ্যপঞ্জি

---

[১] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ২/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৪৭।

[২] *তদেব* ৩/৮/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৮ ।

[৩] *তদেব* ১০/৩৪/২-৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ১১৪৬-১১৪৭।

[৪] তত্রৈব।

[৫] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ২/১৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ২৬০।

[৬] *তদেব* ৭/১২/৭, পৃ. ৮৭৫।

***

চতুর্থ অধ্যায়

বৃহদ্দেবতা ও *মহাভারতে* প্রাপ্ত নির্বচন

৪.০. ভূমিকা

বৈদিকনির্বচন যে শুধুমাত্র সংহিতা ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের শোভা বর্ধন করেছে তা নয়, এইসব সাহিত্যের আলোকে আলোকিত গ্রন্থসমূহেও তৎকালীন গ্রন্থকারদের হাত ধরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। এপ্রসঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবি রাখে আচার্য শৌনক বিরচিত *বৃহদ্দেবতা* নামক প্রকরণগ্রন্থ। বৈদিক বা বেদনির্ভর গ্রন্থের মতো লৌকিক সংস্কৃত-সাহিত্যেও যে নির্বচন বা নির্বচন পদ্ধতির অবাধ বিচরণ বিদ্যমান তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হল মহর্ষি ব্যাসদেব প্রণীত *মহাভারত* নামক মহাকাব্য। সমগ্র *বৃহদ্দেবতায়* প্রাপ্ত নির্বচন এবং *মহাভারতে*র উদ্যোগ ও শান্তিপর্বে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম-নির্বচনসমূহ এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

৪.১. *বৃহদ্দেবতায়* প্রাপ্ত নির্বচন

৪.১.১. গ্রন্থপরিচয়

শৌনকাচার্যের একাধিক গ্রন্থকৃতির মধ্যে অন্যতম হল *বৃহদ্দেবতা* নামক গ্রন্থ। এটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। *ঋগ্বেদসংহিতা* গ্রন্থটির আকরস্বরূপ। দশটি মণ্ডলে সমন্বিত ঋগ্বেদের একশত একানব্বইটি সূক্তে দেবতা ও আখ্যান বর্ণনা গ্রন্থটির মূল বিবেচ্য বিষয়। প্রসঙ্গত সূক্তগুলির ঋষি ও তাঁদের বংশপরিচয় বর্ণনায় সমুজ্জ্বল হয়ে বিদ্যমান। প্রথম অধ্যায়ে দেবতাকে জানার মহত্ব, সূক্তের প্রকারভেদ, অগ্নির তিন রূপ, অগ্নি ও ইন্দ্রের সাথে সম্বদ্ধ দেবতাদের পরিচয় ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্র, সূর্য, পর্জন্য, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতাদের আলোচনায় সমৃদ্ধ। তৃতীয় অধ্যায়ে *ঋগ্বেদস্থি*ত প্রথম মণ্ডলের ১৩-১২৬ সূক্তের দেবতা, চতুর্থ অধ্যায়ে পরিশিষ্ট সূক্ত, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মণ্ডলের ৩২তম সূক্তের ঋষি, দেবতা ও তাঁদের বাহক বিষয়ে বর্ণনা উপস্থিত। পঞ্চম অধায়ে ৩৩তম সূক্ত থেকে সপ্তমমণ্ডলের ৪৯তম সূক্তের দেবতা, ঋষি ইত্যাদি বিষয় বর্তমান। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সপ্তম মণ্ডলের ৫০তম সূক্ত থেকে দশম মণ্ডলের ১৭তম সূক্ত, সপ্তম অধ্যায়ে দশম মণ্ডলের ১৮তম সূক্তে দেবতা এবং অষ্টম অধায়ে ১৯১তম সূক্তের দেবতা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

৪.১.২. নির্বচনসমূহের উৎসসন্ধান

অগ্নি

শৌনকাচার্য বিরচিত *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থে ‘অগ্নি’ শব্দের উৎপত্তির কারণস্বরূপ একাধিক নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বিদ্যমান নির্বচনটি হল-

> নীযতেঽযং নৃভির্যস্মান্ নযত্যস্মাদসৌ চ তম্।
> তেনামৌ চক্রতুঃ কর্ম সনামানৌ পৃথক্ পৃথক্।।[1]

যেহেতু এটি (পার্থিবাগ্নি) মানুষের দ্বারা নীয়মান হয়, এটিই (দিব্য-অগ্নিরূপে) এই পৃথিবী থেকে মানুষকে নিয়ে যায়। অতএব সমান নামবিশিষ্ট এই দুই অগ্নি পৃথক পৃথক কর্ম করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অগ্নির পাঁচ নামের উৎপত্তি বর্ণনাকালে প্রথমেই অগ্নি নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

জাতো যদগ্রে ভূতানাম্ অগ্রণীরধ্বরে চ যত্।
নাম্না সংনযতে বাঙ্গং স্তুতোঽগ্নিরিতি সূরিভিঃ।।[২]

যেহেতু ভূতসমুহের অগ্রে জাত হন এবং হিংসারহিত যজ্ঞে অগ্রণী হন। নিজের অঙ্গকে একীভূত করে নেয় অর্থাৎ নিকটস্থিত সব পদার্থকে নিজের অঙ্গে পরিণত করেন বা দাহ্য রূপে আত্মসাৎ করেন তাই দেবতাদের দ্বারা অগ্নি নামে অভিহিত হন।

উৎস সন্ধান

প্রথম নির্বচনে 'নীযতে' ও 'নযতি' এই দুই ক্রিয়াপদের উপস্থিতি থেকে অনুমান করা যায় 'অগ্নি' শব্দের উৎপত্তিতে √নী-ধাতুর (*ণীঞ্ প্রাপণে,* ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৯০১) প্রাধান্য বিদ্যমান। প্রসঙ্গত 'অগ্নি' শব্দের শেষাংশ 'নি' এর সাথে √নী-ধাতুর বর্ণগত সাম্য বিদ্যমান।

দ্বিতীয় নির্বচনে 'অগ্রে জাত' অর্থাৎ 'অগ্রজ' শব্দের অ-কারের সাথে অগ্নির আদ্যংশ অকারের অক্ষরগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অতএব এই শব্দ থেকে 'অগ্নি' শব্দের উৎপত্তি নিষ্পন্ন করা যায়। পুনরায় 'অগ্রণী' শব্দ থেকে অগ্নি শব্দের উৎপত্তির সংকেত পাওয়া যায়। তৃতীয়ত 'সংনযতে' এই ক্রিয়াপদ এবং 'অঙ্গ' শব্দ থেকে 'অঙ্গ' ও √নী-ধাতু প্রাপ্ত হয়ে অঙ্গ + √নী-ধাতু যুক্ত করে 'অগ্নি' শব্দ সিদ্ধ করা যায়।

ইন্দ্র

বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রের ছাব্বিশটি নামের উৎপত্তি বর্ণনার সময় 'ইন্দ্র' নামেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হয়েছে, সেটি যথা-

চতুর্বিধানাং ভূতানাং প্রাণো ভূত্বা ব্যবস্থিতঃ।
ঈষ্টে চৈবাস্য সর্বস্য তেনেন্দ্র ইতি স স্মৃতঃ।[৩]
ইরাং দৃণাতি যৎকালে মরুদ্ভিঃ সহিতোঽম্বরে।
রবেণ মহতা যুক্তঃ তেনেদ্রমৃষযোঽব্রুবন্।।[৪]

চার প্রকার ভূত অর্থাৎ জীবের ব্যবস্থিত প্রাণ হয়ে তিনি এই সবকিছু বা বিশ্বকে শাসন করেন সেইজন্য তাঁকে ইন্দ্র নামে স্মরণ করা হয়।

যেহেতু তিনি মরুতের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে যথাসময়ে ভীষণ গর্জনের সাথে আকাশে জলকে প্রকট করেন তাই ঋষিগণ তাঁকে ইন্দ্র বলেন।

উৎসসন্ধান

'ইন্দ্র' শব্দের দুটি নির্বচন থেকে শব্দটির উৎস সম্পর্কে দুটি ভিন্ন উপায়ের সংকেত পাওয়া যায়। প্রথম নির্বচনে 'ঈষ্টে' এই ক্রিয়াপদের উপস্থিতি অনুসারে √ঈশ্-ধাতু (*ঈশ ঐশ্বর্যে,* অদাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০২০) থেকে 'ইন্দ্র' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে অনুমান করা যায়। √ঈশ্-ধাতুর ঈকার হ্রস্ব হয়ে 'ইন্দ্র' শব্দের আদ্যংশ ইকার প্রাপ্ত হয় এবং তা থেকেই শব্দটির উৎপত্তি সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় নির্বচনে 'ইরাং দৃণাতি' অংশ থেকে সংকেত পাওয়া যায় ইরা শব্দপূর্বক √দৃ-ধাতু (*দৃ বিদারণে,* ক্র্যাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৪৯৩) থেকে 'ইন্দ্র' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে (ইরা + √দৃ ধাতু > ইন্দ্র)।

বরুণ

বৃহদ্দেবতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রের নামসমূহের উৎপত্তি আলোচনাকালে ইন্দ্র 'বরুণ' হিসাবেও বর্ণিত হয়েছেন। ইন্দ্রের বরুণত্ব প্রতিষ্ঠাস্বরূপ বলা হয়েছে-

ত্রীণীমান্যাবৃণোত্যেকো মূর্তেন তু রসেন যত্।

তথৈনং বরুণং শক্ত্যা স্তুতিষ্বাহুঃ কৃপণ্যবঃ।[৫]

যেহেতু তিনি একাই স্থূল আর্দ্রতা বা রসের দ্বারা পৃথিব্যাদি তিন লোককে আবৃত করে আছেন অতএব তাঁর এই কর্মের জন্যই ঋষিগণ তাঁকে (ইন্দ্রকে) স্তুতিকালে বরুণ নামে অভিহিত করেন।

উৎসসন্ধান

নিরুক্তিতে বিদ্যমান 'আবৃণোতি' ক্রিয়াপদের অর্থ আবরণ করা। যেহেতু লোকত্রয়কে আবৃত করেন তাই বলা যায় আবরণার্থক √বৃ-ধাতু থেকে 'বরুণ' শব্দের নিষ্পত্তির চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার।

৪.১.৩. উপসংহার

আদ্যন্ত বিচারপূর্বক দেখা যায়, শৌনকাচার্য দ্বারা প্রদর্শিত নিরুক্তিতে *নিরুক্ত*কার আচার্য যাস্কের প্রভাব সুস্পষ্ট। অধিকাংশ শব্দের নির্বচন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যাস্কাচার্য যে উপায়ে বা যে ধাতু বা শব্দ দ্বারা ব্যুৎপত্তি করেছেন *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থকার সেই ধাতু বা শব্দ অনুকরণ করেছেন, তবে সর্বত্র তা নয়, তিনি *নিরুক্ত*কারের মত যেমন উল্লেখ করেছেন তেমনি বিকল্প উপায়স্বরূপ স্ব-চিন্তনেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন (যেমন ইন্দ্র-শব্দ)। এছাড়াও ব্যাকরণগত সংস্কার অনুসারেও তিনি শব্দের নিরুক্তি করেছেন (যেমন- বরুণ)।

৪.২. *মহাভারতে* (উদ্যোগপর্ব ও শান্তিপর্ব) প্রাপ্ত নির্বচন

৪.২.১. গ্রন্থপরিচয়

ভারতীয় লৌকিকসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হল কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব রচিত *মহাভারত* নামক আর্ষ-মহাকাব্য। গ্রন্থটি আঠারোটি পর্বে বিন্যস্ত, সেগুলি যথা- আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, কর্ণ, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রাস্থানিক এবং স্বর্গারোহণ। কৌরব ও পাণ্ডবদের বিরোধ, শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় অষ্টাদশ দিন যাবৎ মহাযুদ্ধের অবসানে ন্যায়পরায়ণ পান্ডবদের জয়লাভ মূল বিবেচ্য বিষয় হলেও এর আশ্রয়ে অসংখ্য কাহিনী, উপাখ্যান, নীতিমূলক উপদেশ ও অনুশাসন, ধর্মনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সমস্ত তত্ত্ব একত্রিত হয়ে এক সামগ্রিক সাহিত্যের রূপ লাভ করেছে। এই মহাকাব্যের অন্তর্গত উদ্যোগ ও শান্তিপর্বে বর্ণিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামের নির্বচনগুলিই আলোচ্য অধ্যায়ে পর্যালোচনার আকর হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

৪.২.১.২. যাস্কীয় নির্বচনপদ্ধতি অনুসারে নির্বচনসমূহের বিশ্লেষণ

*মহাভারতে*র উদ্যোগপর্বে ও শান্তিপর্বে বিভিন্ন কাহিনীর বর্ণনাবসরে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামের ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করা যায়। উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণের নাম ও কর্মের অভিপ্রায়ের জ্ঞাতা সঞ্জয়কে পুরুষোত্তম ভগবান সম্পর্কে বর্ণনা করতে বললে বলেন, তিনি ভগবান বাসুদেবের মঙ্গলময় নামের ব্যুৎপত্তি শুনেছেন, তবে যতটুকু তাঁর স্মরণে আছে তিনি ততটুকুই বলবেন কারণ ভগবান কেশব অপ্রমেয়। সারথি সঞ্জয়কর্তৃক বর্ণিত নির্বচন এবং শান্তিপর্বে ভগবান স্বয়ং নিজের যে নাম-নির্বচন বর্ণনা করেছেন সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক-

কৃষ্ণ

'উদ্যোগপর্বে' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'কৃষ্ণ' নামের নির্বচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।

বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি সাত্বতঃ।।[৬]

অর্থাৎ 'কৃষ্' ধাতু নিষ্পন্ন 'কৃষি' শব্দ অস্তিত্ব বা সত্তাবাচক এবং 'ণ' আনন্দ অর্থের বোধক। এই দুই ভাব যুক্ত হয়ে যদুকুলে অবতীর্ণ নিত্য আনন্দস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুকে 'কৃষ্ণ' বলা হয়।

যাস্কীয় নির্বচনপদ্ধতি

'উদ্যোগপর্বে' বিদ্যমান 'কৃষ্ণ' শব্দের নির্বচনে শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। নির্বচনে √কৃষ্-ধাতু থেকে জাত 'কৃষি' শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'ভূ' অর্থাৎ সত্তাবাচক আবার, √কৃষ্ ধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ হল কর্ষতি, যার অর্থ কর্ষণ করা বা আকর্ষণ করা। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সত্-স্বরূপ। তত্ত্বজ্ঞান জন্মালে তিনি সমস্ত জগৎকে নিজের মধ্যে কর্ষণ করেন। তিনিই আবার আনন্দস্বরূপ। তাঁর এই দুই গুনের সংযোগেই কৃষ্ণ এই নাম। অতএব √কৃষ্-ধাতুর সাথে 'ণ' যুক্ত করে 'কৃষ্ণ' শব্দের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়েছে (*কৃষ বিলেখনে*, ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৯৯০)। অতএব 'কৃষ্ণ' শব্দের নির্বচনটি যাস্কীয় অতিপরোক্ষ-নির্বচন শ্রেণীর অন্তর্গত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

'শান্তিপর্বে' শ্রীকৃষ্ণ নিজের কৃষ্ণত্ব প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে যা বলেছেন সেটি হল-

কৃষামি মেদিনীং পার্থ! ভূত্বা কার্ষ্ণায়সো মহান্।

কৃষ্ণবর্ণশ্চ মে যস্মাত্তস্মাৎ কৃষ্ণোঽহমর্জুন! [৭]

পৃথানন্দন অর্জুন! আমি লাঙ্গলের বিশাল লৌহময় ফাল হয়ে ভূমি কর্ষণ করি অথবা যেহেতু আমার কৃষ্ণবর্ণ সেহেতু আমি কৃষ্ণ।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

এখানে 'কৃষ্ণ' শব্দের উৎপত্তির দুটি হেতু নির্দেশিত হয়েছে। প্রথমটি হল কর্ষণকারীরূপে 'কৃষ্ণ' আর দ্বিতীয় কারণ হল কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব। অতএব কর্ষণার্থক *কৃষ বিলেখনে* ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'নক্'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'কৃষ্ণ' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে যেমন অনুমান করা যায় তেমনি 'কৃষ্ণবর্ণ যস্য সঃ' এইরূপ বিগ্রহ দ্বারাও বহুব্রীহিসমাস নিষ্পন্ন হিসাবেও শব্দটি সিদ্ধ করা যায়। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শান্তিপর্বে 'কৃষ্ণ' শব্দের ব্যাকরণগত প্রত্যক্ষ-নির্বচনপদ্ধতিতে নির্বচন করা হয়েছে।

শিপিবিষ্ট

ভগবান কেশব শান্তিপর্বে তাঁর 'শিপিবিষ্ট' নামের নির্বচনস্বরূপ বলেছেন-

শিপিবিষ্টেতি চাখ্যাযাং হীনরোমা চা যো ভবেৎ।

তেনাবিষ্টং তু যত্ কিঞ্চিৎশিপিবিষ্টেতি চ স্মৃতঃ।।[৮]

অর্থাৎ শিপিবিষ্ট এই আখ্যায় বলা হয়- যিনি রোমহীন অর্থাৎ নিরংশ, অখণ্ড তাঁকে শিপি বলা হয়। এই শিপির দ্বারা নিরাকাররূপে জগতের সকল বস্তুতে আবিষ্ট হওয়ায় আমি শিপিবিষ্ট নামে অভিহিত হই।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

শ্রীকৃষ্ণ শিপি দ্বারা আবিষ্ট হওয়ায় তাঁর আর এক নাম 'শিপিবিষ্ট'। যদিও নিরুক্তিটির বিশ্লেষণ থেকে শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিষয়ে সহজেই অনুমান করা যায় তথাপি ভারতকৌমুদীকার শব্দটির ব্যুৎপত্তিস্বরূপ বলেছেন-

"শিপিনা বিষ্ট ইতি ব্যুৎপত্তেঃ"[৯] অর্থাৎ 'শিপি' শব্দপূর্বক √বিষ্-ধাতুর সাথে 'ক্ত'-প্রত্যয় যুক্ত করে শিপিবিষ্ট শব্দটি উৎপন্ন হয়। অতএব যাস্কীয়-প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতি অবলম্বনে নিরুক্তি করা হয়েছে।

পৃশ্নিগর্ভ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি অন্যতম নাম 'পৃশ্নিগর্ভ'। শান্তিপর্বে তাঁর এই নামের নিরুক্তিস্বরূপ বলা হয়েছে-

> পৃশ্নিরিত্যুচ্যতে চান্নং বেদা আপোঽমৃতং তথা।
> মমৈতানি সদা গর্ভঃ পৃশ্নিগর্ভস্ততো হ্যহম্।।[১০]

অর্থাৎ অন্ন, বেদ, জল ও অমৃতকে পৃশ্নি বলা হয়। সেগুলি সর্বদা আমার গর্ভে থাকে। অতএব আমার নাম পৃশ্নিগর্ভ।

যাস্কীয়নির্বচনপদ্ধতি

'পৃশ্নিগর্ভ' শব্দের নির্বচন থেকে শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিষয়ে সহজেই অনুমান করা যায়। অন্নাদি পৃশ্নি ভগবান কেশবের গর্ভে সর্বদা বিদ্যমান থাকায় তিনি এই নামে অভিহিত হন অর্থাৎ 'পৃশ্নিগর্ভঃ যস্য সঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য দ্বারা শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা যায়। ব্যাকরণসম্মত উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এটি যাস্কীয়প্রত্যক্ষনির্বচনপদ্ধতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্বরূপ।

৪.২.১.৩. উপসংহার

মহাভারতের উদ্যোগ ও শান্তি পর্বে শ্রীকৃষ্ণের নানা মহিমান্বিত নামের অর্থ প্রদর্শনের জন্য যে নির্বচনের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তা এককথায় অনন্য। নির্বচনগুলি সুনিপুণ ও সুপ্রসিদ্ধ উপায়ে ভগবান্ কেশবের বিবিধ রূপের পরিচয় প্রদান করেছে। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এবং অতিপরোক্ষ এই তিন যাস্কীয়নির্বচনসিদ্ধান্ত অনুসারে নিরুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় *মহাভারতে* তাঁর নির্বচনসিদ্ধান্তের সঠিক প্রয়োগ বিদ্যমান। তবে ওপর দুই পদ্ধতি অপেক্ষায় প্রত্যক্ষ-নির্বচনপদ্ধতির অধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এতে গ্রন্থকারের শব্দশাস্ত্র বিষয়ে দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

তথ্যপঞ্জি

----

[১] রামকুমার রায় (সম্পা.), *বৃহদ্দেবতা* ১/৯১, পৃ. ২২।
[২] *তদেব* ২/২৪, পৃ. ৩৭।
[৩] *তদেব* ২/৩৫, পৃ. ৪০।
[৪] *তদেব* ২/৩৬, পৃ. ৪০।
[৫] *তদেব* ২/৩৩, পৃ. ৩৯।
[৬] *মহাভারতম্* (উদ্যোগপর্ব ১৪), বিশ্ববাণী প্রকাশনী ৬৬/৫১, পৃ. ৬৮৩।
[৭] *মহাভারতম্* (শান্তিপর্ব ৩৭), বিশ্ববাণী প্রকাশনী ৩২৮/২৬৫, পৃ. ৩৬৬৬।
[৮] *মহাভারতম্* (শান্তিপর্ব ৩৭), ৩২৮/২৫৭, পৃ. ৩৬৬৪।
[৯] তত্রৈব।
[১০] *মহাভারতম্* (শান্তিপর্ব ৩৭), ৩২৭/৪২, পৃ. ৩৬২৩।

***

পঞ্চম অধ্যায়

বেদমীমাংসা ও *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে নির্বচন

৫.০. ভূমিকা

বৈদিক যুগের মূল সাহিত্যসম্ভার চতুর্বেদাদিশাস্ত্রে দুরূহ ঋষিচিন্তনের তথাকথিত উষর ভূমিতে নির্বিঘ্ন অবতরণের মাধ্যম হিসাবে নির্বচন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়, যা বেদব্যাখ্যার ধারাকে আরও সহজ ও প্রাঞ্জল রূপ প্রদান করে। এই পদ্ধতি শুধু তৎকালীন সাহিত্যেরই অঙ্গ ছিলনা, পরবর্তী লৌকিকসাহিত্য অবধি এর অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হয়েছে এবং এই প্রবহমানতাকে আরও গতি প্রদান করেছে উনবিংশ শতকে ভারতীয় মনীষীদের বেদব্যাখ্যায় নির্বচনের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট। তাঁদের মধ্যে দুই অন্যতম প্রণম্য ও সর্বাগ্রগণ্য হলেন শ্রীমৎ অনির্বাণ মহোদয় এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। *বেদমীমাংসা* গ্রন্থের রচয়িতা হলেন শ্রীমৎ অনির্বাণ এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয় *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থ রচনা করেন। উভয় গ্রন্থের বেদব্যাখ্যায় প্রাপ্ত নির্বচন আলোচ্য শোধপ্রবন্ধের আকরস্বরূপ।

প্রাথমিকভাবে গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিবেচ্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে-

৫.১. গ্রন্থপরিচয়

শ্রীমৎ অনির্বাণের এক অনন্য সৃষ্টি হল *বেদমীমাংসা* গ্রন্থ। এটি তিনটি খণ্ডে ও তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে বেদব্যাখ্যার পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা বিদ্যমান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈদিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের আনুমানিক অর্ধাংশ আলোচিত হয়েছে। এখানে বৈদিক দেবতাদের সাধারণ পরিচয় এবং পৃথিবী ছাড়া পৃথিবীস্থান দেবতাদের বিস্তৃত বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় খণ্ড পৃথিবীস্থান দেবতাদের স্বরূপ আলোচনার প্রসঙ্গ শেষ করে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের প্রধান তথা বৈদিকদের পরম দেবতা ইন্দ্রদেবের স্বরূপ আলোচনাতেই সমৃদ্ধ হয়েছে।

৫.১.১. *বেদমীমাংসা* গ্রন্থে নির্বচন

বেদমীমাংসা গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে অর্থাৎ সমগ্র তৃতীয় অধ্যায়ে বৈদিক দেবতা বিষয়ে আলোচনাকালে এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলি যৌগিক এবং পারিভাষিক উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হয়। এইরকম শব্দের প্রয়োগ সুপ্রচুর হওয়ায় তাদের তাৎপর্যনির্ণয়ে নিরুক্তি একটা প্রধান অবলম্বন। যদিও আচার্য অনির্বাণ *বেদমীমাংসা* নামক বেদব্যাখ্যামূলক গ্রন্থটি বঙ্গভাষায় রচনা করায় (দেবতার বিশেষণমূলক) শব্দগুলির নিরুক্তি বাংলাভাষাতেই প্রদর্শিত হয়েছে। নিরুক্তি বা ব্যুৎপত্তিগুলির সামগ্রিক বিশ্লেষণ দ্বারা শব্দগুলির উৎসসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক-

আদিত্য

শ্রীমৎ অনির্বাণ *বেদমীমাংসা* গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বৈদিক দেবতা বিষয়ে আলোচনাকালে প্রথমেই দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সেখানে আকাশের সূর্যকে দেবতার স্বরূপ জ্যোতির প্রতীক বলা হয়েছে এবং অখণ্ডিতা, অবন্ধনা অদিতির পুত্র হিসাবে পরিচয় জ্ঞাপন করে বলা হয়েছে-

> সূর্য আদিত্য কিনা অদিতির পুত্র। অদিতি সংজ্ঞার অর্থ অখণ্ডিতা, অবন্ধনা।[১]

বিমর্শ

গ্রন্থকার সূর্যের আদিত্য নামের হেতুস্বরূপ বলেছেন আনন্ত্যস্বরূপিণী আকাশ যাঁর প্রতীক সেই অদিতির পুত্র হওয়ায় সূর্য 'আদিত্য'। ব্যাকরণগত শব্দগঠন-প্রক্রিয়া অনুযায়ী 'অদিতি' শব্দের সাথে অপত্যার্থে 'ঞ্য'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'আদিত্য' শব্দটি উৎপন্ন হয়, যার অর্থ 'অদিতির পুত্র'। অতএব বলা যায় *বেদামীমাংসা* গ্রন্থের প্রণেতা 'আদিত্য' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ প্রাপ্তির জন্য ব্যাকরণের সহায়তা নিয়েছেন।

উর্বশী

অনিবাধ বৈপুল্যের সংজ্ঞাবাচক বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যাবসরে 'উর্বশী' শব্দ গৃহীত হয়েছে। গ্রন্থকার শব্দটির অর্থ করেছেন-

> উরু বা বৈপুল্যকে অধিকার করে আছেন যিনি তিনি উর্বশী।[২]

বিমর্শ

'বৈপুল্যের অধিকারী' শব্দের সমানার্থক শব্দ ব্যাপ্ত্যকারী। উরু বা বৈপুল্যের অধিকারী অর্থাৎ ব্যাপ্তকারী এক অজ্ঞাতনামা দেবী হলেন 'উর্বশী'। অতএব উরু' শব্দপূর্বক ব্যাপ্ত্যর্থক √অশ্-ধাতু (*অশূ ব্যাপ্তৌ সংঘাতে চ,* স্বাদিগণ, ১২৬৪) থেকে 'উর্বশী' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে।

বিদ্বান্, বিশ্ববেদাঃ

দেবতার 'বিদ্বান্' ও 'বিশ্ববেদা' এই দুই বিশেষণের কারণ হিসাবে বলেছেন-

> দেবতা সবকিছু খুঁটিয়ে দেখেন এবং জানেন। তাই তিনি বিদ্বান্, বিশ্ববেদাঃ।[৩]

বিমর্শ

দেবতার সর্ববিৎ-রূপ গুণের পরিচয়প্রদানস্বরূপ পূর্বোক্ত বিশেষণদ্বয় প্রযুক্ত হয়েছে। জ্ঞানার্থক √বিদ্-ধাতু থেকে 'বিদ্বান্' নামক শব্দের উৎপত্তি এবং 'বিশ্ব'-শব্দ 'সর্ব'-শব্দের সমানার্থক অর্থাৎ সব-কিছুর জ্ঞাতা হওয়ায় দেবতা 'বিশ্ববেদাঃ'। অতএব শব্দটি 'বিশ্ব' এই শব্দপূর্বক √বিদ্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন করা যায়।

ধীর

জ্ঞানবান্ হিসাবে দেবতার ওপর এক বিশেষণ হল 'ধীর'। এই শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন-

> নিখিল ধী বা বিজ্ঞানের উৎস বলে তিনি ধীর।[৪]

বিমর্শ

'ধী অস্যাস্তি ইতি'- এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা অস্ত্যর্থে 'ধী'-শব্দের সাথে 'র'-প্রত্যয় যুক্ত করে 'ধীর' শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়।

৫.১.২. উপসংহার

বিংশ শতকে রচিত হলেও বা বাংলা ভাষায় লিখিত হলেও বৈদিকদেবতাসমূহ বৈদিক নির্বচনের ছত্রছায়ায় ভিন্ন অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং এখানেও যাস্কীয়-নির্বচন-সিদ্ধান্তের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

৫.২. *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে নির্বচন

৫.২.১. গ্রন্থকার ও তাঁর সাহিত্যচর্চা

বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য বৈদিক ধর্মের প্রকৃতার্থ উদ্ঘাটনের নিমিত্ত যিনি সারাজীবন ব্যয় করেছেন তিনি হলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। প্রকৃত নাম ছিল মূলশঙ্কর তিওয়ারি। তাঁর মূল লক্ষ্যই ছিল চার বেদ ও সংহিতা অনুসরণে সমাজ তৈরি করা। তিনি কিন্তু বৈদিক দেবতাবাদে আস্থাশীল ছিলেননা। নিরুক্তকারসম্মত তিন দেবতা অথবা যাজ্ঞিকগণের তথাকথিত বহুদেবতাবাদ তিনি স্বীকার করেননা। তিনি অদ্বৈতবেদান্তী ছিলেন। বেদের দেবতামণ্ডলীর এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন এবং মন্ত্রের দেবতাবাচক সকল শব্দের অর্থ পরমাত্মা বা পরমেশ্বরপরত্বে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রায় উনষাট বছরের জীবদ্দশায় তিনি অনেক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে বেদভাষ্যকার হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি অধিক। কয়েকটি বেদবিষয়ক গ্রন্থ হল- *ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা, ঋগ্বেদভাষ্য* (৭/৬১/১,২), *যজুর্বেদভাষ্য, সত্যার্থপ্রকাশ, পঞ্চমহাযজ্ঞবিধি, বেদাঙ্গপ্রকাশ* ইত্যাদি।

সত্যার্থপ্রকাশ নামক গ্রন্থের পূর্বার্ধের অন্তর্গত প্রথম সমুল্লাসে বিভিন্ন বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে যে নির্বচনের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে সেগুলিই আলোচ্য শোধপ্রবন্ধের আকরস্বরূপ।

৫.২.১.১. *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে প্রাপ্ত নির্বচন-বিমর্শ

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর *সত্যার্থপ্রকাশ* নামক গ্রন্থের প্রথম সমুল্লাসে বিভিন্ন বৈদিক মন্ত্রে প্রাপ্ত ওঙ্কাকারাদি নামের পরমেশ্বর অর্থে যে ব্যাখ্যা প্রদর্শন করেছেন তা বৈদিক নির্বচনশৈলীরই পরিচয় বহন করে। প্রায় একশত নামের ব্যাখ্যার দ্বারা এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিবিধ স্বরূপ ও মহিমা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তারও পূর্বে পরমাত্মাবাচক বেশ কিছু শব্দ ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেগুলি সহ প্রথম পঞ্চাশটি শব্দ আলোচনার বিষয় হিসাবে সংগৃহীত হয়েছে।

নিম্নে সেই সমস্ত ঈশ্বরনামব্যাখ্যা তথা নির্বচনগুলি বিশ্লেষণপূর্বক আধুনিক যুগের নির্বচনকার হিসাবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করা যাক-

বিরাট্

পরমেশ্বরের ‘বিরাট্’ নামের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয়েছে, যিনি বিবিধ অর্থাৎ বহু প্রকারে জগৎকে প্রকাশিত করেন তিনিই বিরাট্-

> যো বিবিধং নাম চরাচরং জগদ্ রাজযতি প্রকাশযতি স বিরাট্।[৫]

বিমর্শ

‘বি’-এই উপসর্গপূর্বক √রাজ্-ধাতুর (*রাজৃ দীপ্তৌ,* ভ্বাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৮২২) উত্তর ‘ক্বিপ্’-প্রত্যয় যুক্ত করে ‘বিরাট্’ রূপটি পাওয়া যায়। বিবিধরূপে জগৎকে আলোকিত বা প্রকাশিত করায় পরমেশ্বরের ‘বিরাট্’ এই নাম হয়েছে। অতএব নির্বচনান্তর্গত ‘বিরাট্’ শব্দটিও ব্যাকরণ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঈশ্বর

‘ঈশ্বর’ নামের হেতুস্বরূপ বলা হয়েছে-

> য ঈষ্টে সর্বৈশ্বর্যবান্ বর্ততে স ঈশ্বরঃ।[৬]

যিনি প্রভুত্ব করেন, ঐশ্বর্যবান সেই পরমাত্মাই ‘ঈশ্বর’ নামে অভিহিত হন।

বিমর্শ

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থে 'ঈশ্বর' শব্দ √ঈশ্-ধাতু (*ঈশ ঐশ্বর্যে,* অদাদিগণ, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০২০) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। গ্রন্থকারের মতে √ঈশ্-ধাতুর সাথে 'বরচ্' এই কৃৎপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে নির্বচনান্তর্গত শব্দটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাকরণ অনুসারেও "স্থেশভাসপিসকসো বরচ্" (পাণিনীয় সূত্র ৩/২/১৭৫) এই সূত্র দ্বারা 'ঈশ্বর' শব্দের উৎপত্তি হয়। অতএব ব্যাকরণ অনুসারেই নির্বচন করা হয়েছে।

বিশ্ব

দয়ানন্দ সরস্বতী মহোদয় ঈশ্বরকে 'বিশ্ব' নামেও অভিহিত করেছেন এবং কারণ হিসাবে বলেছেন-

বিশন্তি প্রবিষ্টানি সর্বাণ্যাকাশাদীনি ভূতানি যস্মিন্ যো বাকাশাদিষু সর্বেষু ভূতেষু প্রবিষ্টঃ স বিশ্ব ঈশ্বর।[৭]

যাতে আকাশাদি সকল ভূত প্রবেশ করে অথবা যিনি এই আকাশাদি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। সেই ঈশ্বর 'বিশ্ব' নামে পরিচিত।

বিমর্শ

দয়ানন্দসরস্বতী মহোদয় 'বিশ্ব' শব্দের উৎপত্তিতে প্রবেশার্থক √বিশ্-ধাতুর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 'অশূপ্রুশিলটিকণিখটিবিশিভ্যঃ ক্বন্' (উণাদি সূত্র ১/১৫১) এই উণাদি সূত্র দ্বারা √বিশ্-ধাতুর সাথে 'ক্বন্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'বিশ্ব' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অতএব তিনি ব্যাকরণসম্মত উপায়েই 'বিশ্ব' শব্দের নির্বচন প্রদর্শন করেছেন।

৫.২.১.২ উপসংহার

পরমেশ্বর অর্থে প্রযুক্ত শব্দগুলি ঈশ্বরের বিবিধ গুণ ও কর্মের পরিচায়ক। কয়েকটি ব্যতিরিক্ত সমস্ত শব্দই ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু শব্দ বিদ্যমান যেগুলি ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি ও ধ্বনিতাত্ত্বিক উভয় পদ্ধতি অনুসারেই ব্যাখ্যাত হয়েছে, যা নির্বচনধর্মীতার পরিচয় প্রকাশ করে।

তথ্যপঞ্জি

---

[১] *বেদমীমাংসা* ২/৩, পৃ. ১৩।

[২] *তদেব,* পৃ. ১৮।

[৩] *তদেব,* পৃ. ৩৮।

[৪] *তদেব,* পৃ. ৩৮।

[৫] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.), *সত্যার্থপ্রকাশঃ* (প্রথম সমুল্লাস), পৃ. ৭৪।

[৬] *তদেব,* পৃ. ৭৫।

[৭] তত্রৈব।

***

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্বাচিত বৈদিকগ্রন্থসমূহে *মহাভারতে* প্রাপ্ত কতিপয় দেববাচক শব্দের তুলনাত্মক আলোচনা

৬.০. ভূমিকা

ধর্মকেন্দ্রিক বৈদিকসাহিত্যের এক বিশেষ অঙ্গ বিভিন্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি, মহিমা-কীর্তন ও যাগযজ্ঞ। সেখানে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে কৃত একাধিক সূক্তের মাধ্যমে যেমন তাঁদের স্বরূপ সম্পর্কে জানা যায়, তেমনি তৎকেন্দ্রিক বিভিন্ন গ্রন্থে যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি বিষয় আলোচনাকালে তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দের অর্থবোধের জন্য সেখানেই শব্দগুলির নির্বচন করা হয়েছে। সেই একই পদ্ধতি পরবর্তী সাহিত্যেও অনুসৃত হয়েছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য নির্বাচিত গ্রন্থগুলি হল-*ছান্দোগ্যোপনিষদ্, নিরুক্ত, বৃহদ্দেবতা, মহাভারত, সত্যার্থপ্রকাশ ও ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা*। এই গ্রন্থগুলিতে একাধিক দেববাচক শব্দের একাধিক নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত নির্বচনসমূহ সংশ্লিষ্ট দেবতাবর্গের স্বরূপ সম্পর্কেই আমাদের অবহিত করে। এক্ষেত্রে আলোচ্য দেবতাবাচক সাতটি শব্দ হল- 'অগ্নি', 'আদিত্য', 'জাতবেদাঃ', 'রুদ্র', বরুণ', 'বিষ্ণু' ও 'হিরণ্যগর্ভ'। দেবতার স্বরূপ উদ্ঘাটক নির্বচনগুলির তুলনাত্মক আলোচনায় ব্যাপৃত হওয়া যাক-

৬.১. অগ্নি

উষ্ণস্পর্শবিশিষ্ট তত্ত্বকে তেজ বলা হয়। এই তেজ তিন প্রকার, যথা- সূর্যরূপ, বিদ্যুদ্রূপ, পার্থিব রূপ। এই তিন তেজ অগ্নিস্বরূপ। এদের মধ্যে পার্থিব তেজরূপ অগ্নির স্থান হল পৃথিবী – "অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ"।[1] সূর্য অগ্নি, বিদ্যুৎ অগ্নি ও পার্থিব অগ্নি এই তিন অগ্নির মধ্যে প্রকৃতিগত দিক থেকে কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। সূর্য অগ্নি স্বতঃপ্রকাশিত হয়, এটি প্রদীপ্ত হওয়ার জন্য কোনো ইন্ধনের প্রয়োজন হয়না। বিদ্যুৎ অগ্নি জলরূপ ইন্ধনে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কাষ্ঠাদি দ্বারা শান্ত হয়। পার্থিব অগ্নি কাষ্ঠাদি দ্বারা উদ্দীপ্ত হয় কিন্তু জল দ্বারা শান্ত হয়। *নিরুক্তে* বলা হয়েছে- "উদকেন্ধনঃ শরীরোপশমনঃ...উদকোপশমনঃ শরীরদীপ্তিঃ"।[2] অগ্নির তিনটি মুখ্য গুণ- উষ্ণতা, দাহকতা ও প্রকাশশীলতা। অগ্নির মুখ্য বা প্রধান কর্মও তিনটি- হবিঃ বহন করা, দেবতাদের আবাহন করা, দৃষ্টিবিষয়ক প্রকাশ প্রদান করা। অগ্নি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বেদে অগ্নিকে আবার দেবতাদের মুখ, বাসস্থান, সেনানী, পোষক, পুরোহিত, হোতা ইত্যাদিও বলা হয়। কাষ্ঠাদি দ্বারা ব্যক্ত অগ্নি ভোজনাদি পরিপাক করে, উদরস্থ অগ্নি ভুক্ত দ্রব্যকে রসাদিতে পরিবর্তিত করে।

৬.১.১. অগ্নি শব্দের নির্বচনসমূহ ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

ব্রাহ্মণোত্তর সাহিত্যের একাধিক গ্রন্থে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে অসংখ্য স্তুতিময় সূক্ত দৃষ্ট হয় এবং অগ্নি শব্দের নামকরণের কারণস্বরূপ একাধিক নির্বচনও দেখা যায়, নির্বচনগুলি হল-

নির্বচনকৃত শব্দ	আকরগ্রন্থ	নির্বচন

অগ্নি	*নিরুক্ত*	"অগ্নিঃ কস্মাত্। অগ্রণীর্ভবতি, অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীযতে, অঙ্গং নযতি সন্নমমানঃ। অক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবির্ন ক্নোপযতি ন স্নেহযতি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জাযত ইতি শাকপূণিঃ। ইতাদক্তাদ্দগ্ধাদ্বা নীতাত্, স খল্বেতেরকারমা-দত্তে গকারমনক্তের্বা দহতের্বা, নীঃ পরঃ"।[৩] [অর্থাৎ অগ্নি অগ্রণী দেবতাদের মধ্যে প্রধান বা দেবতাদের অগ্রণী অর্থাৎ সেনানী। অগ্রে অর্থাৎ প্রথমেই যজ্ঞসমূহে প্রণীত হয়। সন্নত হয়ে অঙ্গতা প্রাপ্ত করায় বা আত্মসাৎ করে। স্থৌলাষ্ঠীবির মতে অগ্নি অক্নোপন অর্থাৎ যা স্নিগ্ধ করেনা, রুক্ষতা সম্পাদন করে। শাকপূণির মতে অগ্নি শব্দটি তিনটি ধাতুর (ক্রিয়াপদ) সমাহারে উৎপন্ন হয়েছে, √ইণ্-ধাতু, √অঞ্জ্-ধাতু বা √দহ্-ধাতু, √নী-ধাতু থেকে। গত্যর্থক √ইণ্ ধাতু থেকে এসেছে অকার। ব্যঞ্জনার্থক √অঞ্জ্-ধাতু থেকে অথবা √দহ্ ধাতু থেকে গকার এসেছে। প্রাপণার্থক √নী ধাতু থেকে এসেছে 'নি']।
	বৃহদ্দেবতা	নীযতেঽযং নৃভির্যস্মান্নযত্যস্মাদসৌ চ তম্। তেনেমৌ চক্রতুঃ কর্ম সনামানৌ পৃথক্ পৃথক্।।[৪] [এই অগ্নি (পার্থিব) যেহেতু মানুষের দ্বারা নীয়মান হয় এবং এই অগ্নি (দিব্য) মনুষ্যকে এই জগৎ সংসার থেকে নিয়ে যায়, তাই অগ্নি এই সমান নামে অভিহিত হলেও উভয়েই পৃথক পৃথক কর্ম সম্পন্ন করে]। জাতো যদগ্রে ভূতানাম্ অগ্রণীরধ্বরে চ যত্। নাম্না সংনযতে বাঙ্গং স্তুতোঽগ্নিরিতি সূরিভিঃ।।[৫] [যেহেতু সকল ভূতবর্গের অগ্রে অর্থাৎ পূর্বে জাত হয়েছেন তাই অগ্নি বলা হয়। যজ্ঞকর্মে অগ্রণী হওয়ায় তিনি অগ্নি। অগ্নি নিজের অঙ্গকে একীভূত করে নেয় অর্থাৎ অগ্নি তার নিকটস্থিত সব পদার্থকে নিজের অঙ্গে পরিণত করে বা দাহ্যরূপে আত্মসাৎ করে, তাই সে অগ্নি]।
	সত্যার্থপ্রকাশ	"অঞ্চ গতিপূজনয়োঃ অগ, অগি, গতেস্ত্রযোঽর্থাঃ জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি পূজনং নাম সৎকারঃ। যোঽঞ্চতি অচ্যতেঽগত্যঙ্গত্যেতি বা সোঽযমগ্নিঃ"।[৬] [অর্থাৎ অগ্নি শব্দটি গত্যর্থক ও পূজার্থক √অঞ্চ্-ধাতু থেকে অথবা গত্যর্থক √অগ্-ধাতু (ও √ইণ্-ধাতু) থেকে নিষ্পন্ন। এখানে 'গতি' শব্দের তিনটি অর্থ 'জ্ঞান', 'গমন' ও 'প্রাপ্তি'। 'পূজা' শব্দের অর্থ 'সৎকার'। সেই ঈশ্বর 'অগ্নি' যিনি জ্ঞান স্বরূপ, জানার, পাওয়ার এবং পূজা করার যোগ্য]।

যাস্কাচার্য তাঁর *নিরুক্ত* গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে দেবতাসমাম্নায়ের প্রত্যেক পদের আনুপূর্বিক ব্যাখ্যাকালে প্রথমেই পৃথিবীস্থান-দেবতা অগ্নির ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পূর্বাচার্যদের মত উল্লেখ করে অগ্নি শব্দের নামকরণের একাধিক কারণ পরিবেশন করেছেন নির্বচন পদ্ধতিতে। প্রশ্নবোধক কিম্ শব্দের (পুংলিঙ্গ অথবা

নপুংসক লিঙ্গ) হেতুবাচক পঞ্চমান্ত 'কস্মাত্' শব্দ উল্লেখ করে বলেছেন- অগ্নিঃ কস্মাত্? অর্থাৎ কেন অগ্নি এই নামকরণ? তার উত্তরে বলেছেন- "অগ্রণীর্ভবতি। অগ্রং যজ্ঞেষু প্রণীযতে। অঙ্গং নযতি সন্নমমানঃ। অক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ। ন ক্নোপযতি ন স্নেহযতি। ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জাযতে ইতি শাকপূণিঃ। ইতাত্ অক্তাত্ দগ্ধাদ্বা নীতাত্। স খল্বেতেরকারমাদত্তে গকারমনক্তের্বা দহতের্বা নীপরঃ"[৭] অর্থাৎ 'অগ্নি' অগ্রণী দেবতাদের মধ্যে প্রধান বা দেবতাদের অগ্রণী অর্থাৎ সেনানী। স্কন্দস্বামীর মতে- "অগ্নিরগ্রণী প্রধানো দেবতানাম্"।[৮] অতএব বলা যায় অগ্র শব্দ √নী ধাতুর সাথে যুক্তে হয়ে অগ্রণী = অগ্নি শব্দ জাত হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, অগ্রে অর্থাৎ প্রথমেই যজ্ঞসমূহে প্রণীত হয়। যজ্ঞ করতে গেলে অগ্নিপ্রণয়ন-ই প্রথম কার্য। এই প্রসঙ্গে স্কন্দস্বামী বলেছেন বলেছেন- "অগ্রং প্রথমং যজ্ঞেষু কর্তব্যেষু তাদর্থ্যেন প্রণীযতে"।[৯] দুর্গাচার্যের মতটি হল- "ন তাবৎ কিঞ্চিদপ্যন্যৎ ক্রিযতে যাবদযং ন প্রণীযতে ইতি"।[১০] অতএব এখানেও 'অগ্র' শব্দের সাথে √নী-ধাতু যুক্ত করে 'অগ্র + নী' থেকে 'অগ্নি' শব্দ সিদ্ধ হয়। Paolo visigalli তাঁর "Words In and Out of History: Indian Semantic Derivation (Nirvacana) and Modern Etymology in Dialogue" নামক প্রবন্ধে উপরে আলোচিত নির্বচনদুটিকে একটি নির্বচনের মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর মতে যাস্ক 'অগ্নিপ্রণয়ন' কর্মে অগ্নির ভূমিকাকে মাথায় রেখেই বলেছেন- "Why Agni [i.e., why is Agni called 'Agni']? He is the agraṇī ('led-in-the-front') [i.e.,] 'agra-ly' (firstly) he is praṇī-ed (led) in the sacrifices".[১১] Visigalli এর মতে যাস্কাচার্য এই নির্বচনে ধ্বনিপরিবর্তনের দ্বারাই 'অগ্নি' এই পরোক্ষ শব্দের সাথে অন্তর্নিহিত প্রত্যক্ষ শব্দ 'অগ্রণী'-র সম্পর্ক স্থাপন করে 'অগ্রণী' শব্দ থেকেই 'অগ্নি' শব্দ সিদ্ধ করেছেন। 'অগ্র' শব্দের 'র' এর লোপ হয়েছে। এর ফলে অগ্র শব্দের পরবর্তী 'নী' এর ণত্ববিধানের নিয়মানুসারে বিকার প্রাপ্ত মূর্দ্ধন্য 'ণ্' পূর্বাবস্থা অর্থাৎ দন্ত্য ন্ প্রাপ্ত হয় এবং 'নী' এর ঈ-কার ই-কারে পরিবর্তিত হয় (অগ্রণী > অগ্ নী > অগ্নি)।

পরবর্তী নির্বচনে বলা হয়েছে "অঙ্গং নযতি সন্নমমানঃ"[১২] অর্থাৎ সন্নত হয়ে অঙ্গতা প্রাপ্ত করায় বা আত্মসাৎ করে। তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতিতে অগ্নি সন্নত হলে সেগুলিকে দাহ্যরূপে আত্মসাৎ করে। দুর্গাচার্য 'সন্নত' শব্দের অর্থ করেছেন 'আশ্রিত'- "যত্র তৃণে কাষ্ঠে বা সন্নমত্যাশ্রযতি তত্র সন্নমমান এবাত্মনোঽঙ্গতাং নযত্যাত্মসাৎসর্বং করোতি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ"।[১৩] তিনি আরও বলেছেন- "যত্রাযং লৌকিকে বৈদিকে বার্থে সাধনত্বেন সন্নময়ত্যাত্মানং তত্র সন্নমমান এবাত্মানং প্রধানীকৃত্য সর্বমন্যদঙ্গমাত্মনোঽঙ্গতাং নযতি"।[১৪] যে বৈদিক বা লৌকিক কর্মে অগ্নি সন্নত হয় অর্থাৎ সাধনতা প্রাপ্ত হয় তাতে নিজেকে প্রধান করে অন্য সবই অঙ্গীভূত বা অপ্রধান করে। অতএব বলা যায় অঙ্গ + √নী-ধাতু থেকেও অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন করা যায়। ভিসিগাল্লি (Paolo Visigalli) এখানে 'অঙ্গানী' ('অঙ্গ' এবং 'নী' এর যৌগিক রূপ) শব্দ থেকে 'অগ্নি' শব্দ নিষ্পন্ন বলেছেন- অঙ্গাণী > অগানী (ঙ্ লোপ করে) > অগ্ নী (আ লোপ) > অগ্ নি (স্বরবর্ণের হ্রস্বতা) > অগ্নি।

আচার্য যাস্ক তাঁর পূর্বাচার্য স্থৌলাষ্ঠীবির মতও উল্লেখ করেছেন, সেটি হল- "অক্নোপনো ভবতীতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ। ন ক্নোপযতি ন স্নেহযতি"।[১৫] স্থৌলাষ্ঠীবির মতে 'অগ্নি' অক্নোপন অর্থাৎ যা স্নিগ্ধ করেনা, রুক্ষতা সম্পাদন করে। রুক্ষতা সম্পাদন অগ্নির একটি ধর্ম। তাঁর মতে অক্নোপন = অগ্নি, ণিজন্ত √ক্নূযী ধাতু (*ক্নূযী শব্দে উন্দে চ*, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ৫১৪) থেকে নিষ্পন্ন। Max Deeg নিরুক্তস্থিত "অথাপ্যন্তব্যাপত্তির্ভবতি"[১৬] -এই ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মানুসারে 'অক্নূ' থেকে 'অগ্নি' পদ নিষ্পন্ন করেছেন (অক্নূ > অগ্নি)।

শাকপূণির মতে অগ্নি শব্দটি তিনটি ধাতুর (ক্রিয়াপদ) সমাহারে উৎপন্ন হয়েছে- "ত্রিভ্য আখ্যাতেভ্যো জাযত ইতি শাকপূণিঃ।। ইতাত্-অক্তাদ্দগ্ধাদ্বা-নীতাত্।। স খল্বেতে-রকারমাদত্তে, গকারমনক্তের্বা দহতের্বা, নীঃ পরস্তস্যৈষা ভবতি"।[১৭] তাঁর মতে গত্যর্থক √ই ধাতু থেকে এসেছে অকার। ব্যঞ্জনার্থক √অঞ্জ্-ধাতু থেকে

অথবা √দহ্-ধাতু থেকে গকার এসেছে (√অঞ্জ/√দহ্ > গকার)। প্রাপণার্থক √নী-ধাতু থেকে এসেছে 'নি' এই অন্তিমাংশ (নী > নি)। স্কন্দস্বামীর মতে √নী ধাতুর উত্তর 'ডি'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'নি' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। 'অগ্নি' শব্দের মধ্যে পূর্বোক্ত তিন ধাতুর অর্থই বিদ্যমান- অগ্নি গতিসম্পন্ন, অগ্নি পদার্থব্যঞ্জক অথবা পদার্থদাহক, অগ্নি হবিঃ প্রাপক অর্থাৎ দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবিঃ নিয়ে যায়। অতএব 'অ + গ্ + নি = অগ্নি'। বৈয়াকরণ মতে 'অঙ্গের্নলোপশ্চ' (উণাদিসূত্র ৪/৫০) সূত্রানুসারে √অঙ্গ ধাতুর উত্তর 'নি'-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'অগ্নি' পদটি সিদ্ধ হয় (অঙ্গ + নি = অগ্নি)।

শৌনকাচার্য তাঁর *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থে তিন প্রকার 'অগ্নি' সম্পর্কে আলোচনাকালে প্রথমেই 'অগ্নি' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন বলেছেন- "নীযতেঽযং নৃভির্যস্মান্ নযত্যস্মাদসৌ চ তম্। তেনেমৌ চক্রতুঃ কর্ম সনামানৌ পৃথক্ পৃথক্"[১৮] অর্থাৎ এই অগ্নি (পার্থিব) যেহেতু মানুষের দ্বারা নীয়মান হয় এবং এই অগ্নি (দিব্য) মনুষ্যকে এই জগৎ সংসার থেকে নিয়ে যায়, তাই অগ্নি এই সমান নামে অভিহিত হলেও উভয়েই পৃথক পৃথক কর্ম সম্পন্ন করে। এখানে অগ্নি শব্দের আংশিক নির্বচন লক্ষ্য করা যায়। 'নযতি' এবং 'নীযতে' উভয় ক্রিয়াপদ-ই √নী ধাতু নিষ্পন্ন। অতএব 'অগ্নি' শব্দের দ্বিতীয়াংশ 'নি' এর সাথে প্রাপণার্থক √নী-ধাতুর সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও দ্বিতীয় অধ্যায়েও 'অগ্নি' শব্দের নির্বচন প্রদর্শন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে- "জাতো যদগ্রে ভূতানাম্ অগ্রণীরধ্বরে চ যত্। নাম্না সংনযতে বাঙ্গং স্তুতোঽগ্নিরিতি সূরিভিঃ"[১৯] অর্থাৎ ঋষিগণ দ্বারা অগ্নি নামে স্তুত হওয়ার তিনটি কারণ বলা হয়েছে, প্রথমত- যেহেতু সকল ভূতবর্গের অগ্রে অর্থাৎ পূর্বে জাত হয়েছেন তাই 'অগ্নি' বলা হয়। অতএব তিনি ভূতবর্গের অগ্রণী এই অর্থ গ্রহণ করে, 'অগ্র' শব্দের সাথে √নী ধাতু যুক্ত করে 'অগ্নি' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় (অগ্র + নী = অগ্নি)। দ্বিতীয়ত যজ্ঞকর্মে অগ্রণী হওয়ায় তিনি অগ্নি। এখানে যজ্ঞের পূর্বে অগ্নিপ্রণয়ন কর্ম দ্যোতিত হয়েছে। অতএব 'অগ্র' শব্দের সাথে √নী-ধাতু যুক্ত করে অগ্নি শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় (অগ্র + নী = অগ্নি)। আবার যেহেতু অগ্রণী শব্দটি উল্লেখ আছে তাই অগ্রণী শব্দ থেকেও প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম অনুসারে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন করা যায় (অগ্রণী > অগ্নি)। তৃতীয়ত বলা হয়েছে অগ্নি নিজের অঙ্গকে একীভূত করে নেয় অর্থাৎ অগ্নি তার পার্শ্বস্থিত সব পদার্থকে নিজের অঙ্গে পরিণত করে বা দাহ্যরূপে আত্মসাৎ করে, তাই সে অগ্নি। এখানেও 'সংনযতে' ক্রিয়াপদ 'অঙ্গং' শব্দ থেকে অঙ্গ ও √নী-ধাতু গ্রহণ করে 'অগ্নি' শব্দ সিদ্ধ করা যায় (অঙ্গ + √নী-ধাতু = অগ্নি)।

সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থেও ঈশ্বরের নামসমূহ ব্যাখ্যাকালে ঈশ্বর বাচক অগ্নি শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন জ্ঞানস্বরূপ, সর্বজ্ঞ, জানার, পাওয়ার এবং পূজা করার যোগ্য সেই পরমেশ্বর-ই অগ্নি- "যোঽঞ্চতি অচ্যতেঽগত্যঙ্গত্যেতি বা সোঽযমগ্নিঃ"[২০] অর্থাৎ গত্যর্থক ও পূজার্থক √অঞ্চ্-ধাতু (*অঞ্চু গতিপূজনয়োঃ*, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৮৮), অগি ধাতু (*অগি গত্যর্থে*, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১৪৬), √ইণ্ ধাতু (*ইণ গতৌ*, পাণিনীয়ধাতুপাঠ ১০৪৫) থেকে অগ্নি শব্দ সিদ্ধ হয়। গতি ও পূজা শব্দদ্বয়ের অর্থও উল্লেখ করা হয়েছে- "গতেস্ত্রযোঽর্থাঃ জ্ঞানং গমনং প্রাপ্তিশ্চেতি। পূজনং নাম সৎকারঃ"।[২১]

৬.১.২. নির্বচনগুলির তুলনা

- যাস্কাচার্য বিরচিত *নিরুক্ত*গ্রন্থে যে অগ্নি শব্দের নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে সেই অগ্নি হলেন পৃথিবীস্থান দেবতা, *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে কৃত নির্বচক অগ্নি শব্দটি যথাক্রমে পার্থিব অগ্নি ও দিব্য অগ্নির বাচক এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অগ্নি পার্থিব অগ্নি। কিন্তু *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে অগ্নি পরমেশ্বরের নামান্তর।

- *নিরুক্তস্থ*িত নির্বচনের প্রথমেই ‘কস্মাৎ’ এই প্রশ্নবোধক শব্দ উল্লেখ করে নির্বচনটি বর্ণিত হয়েছে, যেটি নিরুক্তকারের নির্বচনপদ্ধতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু *বৃহদ্দেবতা* ও *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে এই বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত।
- তিনটি গ্রন্থেই এক-ই শব্দের নির্বচনে একাধিক সংখ্যক কারণ উল্লেখিত হয়েছে। তাই অগ্নি শব্দের নির্বচনটি অনেকার্থক নির্বচন নামে অভিহিত করা যায়।
- *নিরুক্তে* এবং *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবস্থিত নির্বচনগুলিতে অগ্নি শব্দের পূর্ণ বিশ্লেষণ দ্বারা নির্বচন করা হয়েছে, তাই এগুলিকে পূর্ণ নির্বচন বলা যায়। কিন্তু *বৃহদ্দেবতা* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের নির্বচনে শুধুমাত্র ‘অগ্নি’ শব্দের অন্তিমাংশেরই নির্বচন করা হয়েছে এবং *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে অগ্নি শব্দের প্রথমাংশের নির্বচন করা হয়েছে। অতএব উক্ত নির্বচনগুলি আংশিক বা অপূর্ণ নির্বচন বলা যায়।
- যাস্ককৃত নির্বচনগুলির সাথে *বৃহদ্দেবতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবস্থিত নির্বচনগুলির অধিকাংশের অর্থগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। উভয়েই যজ্ঞে অগ্নির অগ্রগামিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সেই সঙ্গে সকল বস্তুকে দহন শক্তির দ্বারা আত্মসাৎ করা রূপ ধর্মকে মাথায় রেখে উভয়েই তদর্থক নির্বচন প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু যাস্কাচার্য অগ্নিকে দেবতাদের অগ্রণী বললেও আচার্য শৌনক অগ্নিকে সর্বভূতের অগ্রণী বলেছেন।
- শাকপূণির মতে অগ্নি শব্দ একাধিক ধাতুর সামাহারে সৃষ্ট। অতএব এটি একাধিক ধাতুজ নির্বচন। এখানে ক্রিয়ার সাথে শব্দের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান।
- *বৃহদ্দেবতায়* অবস্থিত √নী-ধাতু থেকে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন করেছেন। √নী-ধাতুর সাথে অগ্নি শব্দের অন্তিমাংশের সাদৃশ্য বিদ্যমান,*সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থেও অঞ্চতি, অচ্যতে ক্রিয়াপদের সাথে অগ্নি শব্দের আদ্যংশের ধ্বনিগত সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকলেও তিনটি গ্রন্থেরই ক্রিয়াপদের সাথে অগ্নি শব্দের ধ্বনিসাম্যের বাহুল্য রয়েছে।
- *সত্যার্থপ্রকাশ* গ্রন্থে গত্যর্থক ও পূজার্থক √অঞ্চ-ধাতু থেকে অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, যা অন্য গ্রন্থগুলিতে অনুপস্থিত।

৬.৮. উপসংহার

নির্বচনগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অগ্নির অগ্নিত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, রুদ্রের রুদ্রত্ব ইত্যাদি বিবিধ আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে একই দেবতাবাচক শব্দ একাধিক সম ও ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, যেগুলি তাঁদের নানা গুণ-মাহাত্ম্যেরই দ্যোতক।

তথ্যপঞ্জি

[১] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/৫/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৪৬।

[২] *তদেব* ৭/২৩/১৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৯১৪।

[৩] *তদেব* ৭/১৪/৩-৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৬-৮৮৭।

[৪] রামকুমার রায় (সম্পা.), *বৃহদ্দেবতা* ১/১৭/৯১, পৃষ্ঠাঙ্ক ২২।

[৫] *তদেব* ২/৪/২৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৭।

[৬] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.), *সত্যার্থপ্রকাশঃ* ১/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৪।

[৭] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/১৪/৩-৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৬-৮৮৭।

[৮] তত্রৈব।

[৯] তত্রৈব।

[১০] তত্রৈব।

[১১] Paolo Visigalli, “Words In and Out of History: Indian Semantic Derivation (Nirvacana) and Modern in Itymology Dialogue”. Page- 1144.

[১২] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/১৪/৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৬।

[১৩] মুকুন্দঝাশর্মণ্ (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/৪/১৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৬৯।

[১৪] তত্রৈব।

[১৫] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/১৪/৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৭।

[১৬] মুকুন্দঝাশর্মণ্ (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ২/১/৩, পৃষ্ঠাঙ্ক ৫৯।

[১৭] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/১৪/৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৭।

[১৮] রামকুমার রায় (সম্পা.), *বৃহদ্দেবতা* ১/৯১, পৃষ্ঠাঙ্ক ২২।

[১৯] *তদেব* ২/২৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৭।

[২০] দুর্গা প্রসাদ (সম্পা.), *সত্যার্থপ্রকাশঃ* ১/২, পৃষ্ঠাঙ্ক ৭৪।

[২১] তত্রৈব।

***

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার

বৈদিক সাহিত্যের আদিস্বরূপ সংহিতাভাগ নির্বচনের প্রথম উৎপত্তিস্থল হলেও এটির আঁতুর ঘর হল ব্রাহ্মণসাহিত্য। সামবেদ-সংহিতার অন্তর্গত *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ* এই তিনটি শুদ্ধব্রাহ্মণগ্রন্থে এবং *ছান্দোগ্যোপনিষদ্* ও *কেনোপনিষদ্* এই গ্রন্থদুটিতে এমন অনেক বৈদিক শব্দ বিদ্যমান যেগুলি যৌগিক এবং পারিভাষিক উভয়ভাবেই বিরাজিত। এইসমস্ত শব্দের নির্বচনগুলির সামগ্রিক আলোচনা থেকে অবগত হওয়া যায় যে এগুলি বৈদিক সাহিত্যের গভীরতা আস্বাদনে অমৃতময় ভাণ্ডার। বিভিন্ন যাগযজ্ঞ প্রণালী, দেবতা, বৈদিকমন্ত্র প্রভৃতি বর্ণনাকালে প্রাসঙ্গিকরূপে স্থানে স্থানে নির্বচনগুলি প্রদর্শিত হয়েছে। এগুলি সেই সেই বৈদিকশব্দের শুধু অর্থ প্রদর্শনের ভূমিকায় অবতীর্ণ নয়, পাশাপাশি শব্দটি উৎপত্তির হেতু তথা ইতিহাস উন্মুক্ত আকাশের ন্যায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। কোনো কোনো সময় বিভিন্ন আখ্যান-উপাখ্যানের সরস উপস্থিতি নির্বচনগুলিকে তাদের পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধনে অনন্যতা প্রদান করেছে। আচার্য যাস্ক *নিরুক্ত* গ্রন্থে যে নির্বচন-সিদ্ধান্ত বা নির্বচন-ধারার কথা বলেছেন, তদনুসারে নির্বচনগুলির শব্দার্থ বিশ্লেষণপূর্বক পদ্ধতি নিরূপণের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ জানা যায়- যেসমস্ত স্থানে বৈদিক শব্দটির তৎপ্রযুক্ত অর্থ ব্যাকরণগত শব্দগঠনপ্রক্রিয়াকে অনুসরণ করছে, সেখানে ব্যাকরণগত সংস্কার অনুযায়ী নির্বচন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যত্র বৈদিক পরম্পরা অনুসারে প্রাপ্ত অর্থ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কখনো, 'বর্ণবিপর্যয়', 'বর্ণলোপ', 'বর্ণাগম' প্রভৃতি ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম অবলম্বনে, কখনও বা ক্রিয়াপদের সাথে বর্ণাক্ষরের সমানতা গ্রহণ করে প্রদর্শিত হয়েছে। অতএব পূর্বোক্ত বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ* প্রভৃতি সামবেদীয় নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে যাজ্ঞিক বর্ণনা ও তত্ত্বচিন্তার আধারে প্রদর্শিত নির্বচনগুলির নির্দিষ্ট পদ্ধতিগত কোনো রূপরেখার উল্লেখ না থাকলেও তা যাস্কাচার্য দ্বারা উক্ত নির্বচন-পদ্ধতিকে (অনেকাংশেই) অনুসরণ করেছে। বিবিধ অর্থপ্রদানকারী নির্বচনগুলি পদ্ধতিগত দিক থেকে যথার্থ এবং যাস্কাচার্য দ্বারা নির্দেশিত নির্বচন-পদ্ধতি এইসমস্ত নির্বচনগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষার-ই ফলস্বরূপ।

'*নিরুক্তে* প্রাপ্ত সামবেদীয় শব্দসমূহের নির্বচন' নামক অধ্যায়টির সামগ্রিক আলোচনায় দেখা যায়, মূলত সেই সমস্ত শব্দের নির্বচন এখানে আলোচিত হয়েছে যেগুলি নির্বাচিত সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলিতে এবং যাস্কাচার্য বিরচিত *নিরুক্ত* নামক নির্বচন-গ্রন্থে নির্বচন প্রদর্শনপূর্বক বর্ণিত হয়েছে। *সামবেদসংহিতার* অন্তর্গত নির্বাচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থ যথা- *তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয়োপনিষদ্ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্যোপনিষদ, কেনোপনিষদ্* নামক বৈদিক গ্রন্থগুলিতে নির্বচনকৃত শব্দগুলি সম্পর্কে যাস্কাচার্য কী নিরুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা উল্লেখ ও অর্থনির্ণয়পূর্বক শব্দগুলির উৎস সন্ধান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণগুলিতে সেই একই শব্দের নির্বচনগুলিতে প্রাপ্ত ধাতু-প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ উল্লেখ করে তুলনাত্মক বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। ফলস্বরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থে একই শব্দ যেমন একাধিক ভিন্ন ভিন্ন ধাতু-প্রত্যয় বা শব্দ দ্বারা সিদ্ধ হয়েছে তেমনি একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থে একই শব্দ একই উৎস থেকেও উৎপন্ন হয়েছে। নিরুক্তকার শব্দের উৎপত্তিতে কখনও একটি ব্রাহ্মণগ্রন্থের সাথে, কখনও বা একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থের সাথে সহমত পোষণ করেছেন। আবার একাধিক ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও *নিরুক্তে* একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (যেমন অন্তরিক্ষ শব্দ)। পুনরায় কোন স্থানে ব্রাহ্মণগ্রন্থকে অনুসরণ করলেও তদতিরিক্ত নিজ প্রতিভার প্রকাশস্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যুৎপত্তিরও সন্ধান দিয়েছেন। এছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে যাস্কাচার্য একই শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তির সাথে

তদ্ভিন্ন অর্থের দ্যোতক হিসাবে ভিন্ন ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শন করেছেন, যেটি তাঁর কৃতিত্বে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'আদিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি। অতএব বলা যায় আচার্য যাস্ক বৈদিক নির্বচন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ঠিকই কিন্তু সর্বত্র অন্ধভাবে গ্রহণ না করে নিজ স্বতন্ত্র মহিমারও পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত তাঁর হাত ধরেই বৈদিক নিরুক্ত (নির্বচন) *নিরুক্ত* নামক নির্বচন-গ্রন্থের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

'*বৃহদ্দেবতা* ও *মহাভারতে* প্রাপ্ত নির্বচন'- এই অধ্যায়ে আলোচনার দুই আকর গ্রন্থ হল শৌনকাচার্য বিরচিত *বৃহদ্দেবতা* নামক ঋগ্বেদীয় বৈদিক দেবতার বর্ণনাশ্রিত গ্রন্থ এবং অপরটি হল লৌকিক-সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন *মহাভারত* নামক মহাকাব্য, যেটি মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। *বৃহদ্দেবতায়* বিদ্যমান বৈদিকদেববাচক শব্দগুলির নির্বচনসমূহ অর্থনির্ণয় ও বিশ্লেষণসহ উৎসসন্ধান করেছি। শৌনকাচার্য দ্বারা প্রদর্শিত নিরুক্তিতে *নিরুক্ত*কার আচার্য যাস্কের প্রভাব সুস্পষ্ট। অধিকাংশ শব্দের নির্বচন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যাস্কাচার্য যে উপায়ে বা যে ধাতু বা শব্দ দ্বারা ব্যুৎপত্তি করেছেন *বৃহদ্দেবতা*কার সেই ধাতু বা শব্দ অনুকরণ করেছেন, তবে সর্বত্র তা নয়, তিনি *নিরুক্ত*কারের মত যেমন উল্লেখ করেছেন তেমনি বিকল্প উপায়স্বরূপ স্ব-চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন (যেমন ইন্দ্র-শব্দ), এছাড়াও ব্যাকরণগত সংস্কার অনুসারেও তিনি শব্দের নিরুক্তি করেছেন (যেমন- বরুণ)।

*মহাভারতে*র উদ্যোগ ও শান্তিপর্বে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ নামের নির্বচনগুলি যাস্কাচার্যের তিনটি নির্বচনপদ্ধতি অনুসারে বিশ্লেষণ বিদ্যমান। যদিও ব্যাকরণগত সংস্কারভিত্তিক যাস্কীয়-প্রত্যক্ষনির্বচন পদ্ধতির অধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় তথাপি অন্য দুই পদ্ধতিরও (পরোক্ষ, অতিপরোক্ষ) প্রয়োগ নির্ণয় করা যায়। এর থেকে অনুমান করা যায়, বৈদিক নির্বচন তথা যাস্কীয় নির্বচনপদ্ধতি শুধু বৈদিক সাহিত্যের সম্পদ, তা নয়। এটি একদিকে যেমন বৈদিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি তৎপরবর্তী লৌকিক সাহিত্যেও নিজ গুণে স্বমহিমায় ধরা দিয়েছে।

শ্রীমৎ অনির্বাণ বিংশশতকের মনীষী তথা বেদব্যাখ্যাকার। তাঁর প্রণীত *বেদমীমাংসা* বৈদিক সাহিত্যচর্চার এক অমূল্য সম্পদ। এতদিনে ব্যাকরণ ফুলে-ফলে-শাখায় পল্লবিত হয়েছে মহীরুহ আকার ধারণ করেছে। তথাপি তিনি আলোচ্য গ্রন্থে বৈদিকদেবতা সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিভিন্ন দেববাচক শব্দের অর্থনিরূপণের জন্য নিরুক্তির-ই আশ্রয় নিয়েছেন। গ্রন্থটি বঙ্গভাষায় রচিত হওয়ায় নির্বচনগুলি বাংলাভাষাতেই প্রদর্শিত হয়েছে। উক্ত নির্বচনস্থিত শব্দগুলির সাথে সম্পর্কিত সংস্কৃত শব্দ তথা ক্রিয়াপদগুলির সংস্কৃত রূপ বা ধাতুর অনুসন্ধান করে সামগ্রিকভাবে শব্দটির উৎসসন্ধান যেন অন্ধকারে ঢিল নিক্ষেপের মত, তবে লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার অবকাশ নেই। বিংশ শতকে রচিত হলেও বা বাংলা ভাষায় লিখিত হলেও বৈদিকদেবতাসমূহ বৈদিক নির্বচনের ছত্রছায়ায় ভিন্ন অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এখানেও যাস্কীয়-নির্বচন-সিদ্ধান্তের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

সত্যার্থপ্রকাশ নামক গ্রন্থের প্রথম সমুল্লাসে ঈশ্বরের একশত নাম ব্যাখ্যাত হয়েছে। তারও পূর্বে পরমাত্মাবাচক বেশ কিছু শব্দ ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেগুলি সহ প্রথম পঞ্চাশটি শব্দ আলোচনা করেছি। এখানে 'বিরাট্', 'বিশ্ব', 'হিরণ্যগর্ভ' প্রভৃতি পরমেশ্বর অর্থে প্রযুক্ত শব্দগুলি তাঁর বিবিধ গুণ ও কর্মের পরিচায়ক। কয়েকটি ব্যতিরিক্ত সমস্ত শব্দই ব্যাকরণগত শব্দগঠন প্রক্রিয়া অনুসারেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু শব্দ বিদ্যমান যেগুলি ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি ও ধ্বনিতাত্ত্বিক উভয় পদ্ধতি অনুসারেই ব্যাখ্যাত হয়েছে, যা নির্বচনধর্মীতার পরিচয় প্রকাশ করে।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ নিরুক্ত, বৃহদ্দেবতা, মহাভারত, ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা ও সত্যার্থপ্রকাশ -এই গ্রন্থগুলিতে একাধিক দেববাচক শব্দের নির্বচন প্রদর্শিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি দেবতাবাচক শব্দ যেমন- 'অগ্নি', 'আদিত্য', 'জাতবেদাঃ', 'রুদ্র', 'বরুণ', 'বিষ্ণু' ও 'হিরণ্যগর্ভ' এই সাতটি শব্দের নির্বচনগুলির তুলনাত্মক

আলোচনা থেকে জানা যায় নির্বচনগুলি প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট দেবতাবর্গের স্বরূপ সম্পর্কেই আমাদের অবহিত করে। অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দেবত্ব বিবিধ আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলি তাঁদের নানা গুণ-মাহাত্ম্যেরই দ্যোতক।

অতএব বলা যায় সুদূর অতীতে শব্দের অর্থ নির্ণয়ের জন্য যে নির্বচন-পদ্ধতির আবির্ভাব হয় তা আধুনিকযুগে ব্যাকরণ-পদ্ধতির প্রভাবে হারিয়ে যায়নি বরং ব্যাকরণকে সাথে নিয়েই তার আলোকসামান্য প্রভায় কবি সাহিত্যিকদের হৃদয়ে সদা বিরাজিত।

***

পরিশিষ্ট

একবিংশ শতকে কতিপয় গবেষকের দৃষ্টিতে নির্বচন

বৈদিক ভাষার অলঙ্কারস্বরূপ উদ্ভূত 'নির্বচন' বা 'নির্বচন-পদ্ধতি'র বহমানতা যে শুধু প্রাচীন বা মধ্যযুগেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, আধুনিকযুগের কবি, সাহিত্যিকদের রচনাতেও এটির প্রয়োগ এই পদ্ধতির গুরুত্বকে অন্য মাত্রা প্রদান করেছে। বেদ-গবেষক ও সমালোচকদের দৃষ্টিতে 'নির্বচন' ('নিরুক্তি', 'নিরুক্ত') বিবিধরূপে ধরা দিয়েছে। সেইরকমই একবিংশ শতকে কয়েকজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষকের ভাবনার পাখায় ভর করে নির্বচনকে অনুধাবন করা যাক-

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'Saroja Bhate' (প্রাচ্য বেদবিদ্), 'M. A. Mahendale', 'Eivind Kahrs','J. Bronkhorst', 'Paolo Visigalli' (পাশ্চাত্য বেদ-গবেষক) প্রমুখ বেদবিদ্-দের নির্বচন সম্বন্ধিত প্রবন্ধগুলিতে সিদ্ধান্তিত বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলি যথা-

Paṇini and Yāska: principles of derivation (Saroja Bhate)

নিরুক্ত গ্রন্থে অবস্থিত 'ব্যুৎপত্তি' (Derivation) মানেই তা শব্দের অর্থ বর্ণনা করা, এটিই আবার পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি। পাণিনীয় ব্যাকরণের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়। 'ব্যুৎপত্তি' বিষয় আলোচনা নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু মুখ্য পার্থক্য বিদ্যমান, যেমন-

১. যাস্কর মতে ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি 'প্রত্যক্ষবৃত্তি' শব্দকে কম গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে পাণিনীর মূল লক্ষ্যই ছিল ব্যাকরণগত গঠন প্রক্রিয়া।

২. যাস্কর মতে সকল নামপদেরই গঠন ও অর্থ সমান রেখে ধাতুগত বিশ্লেষণ করা যায় এবং সেই জন্য সমস্ত শব্দই *নিরুক্ত*-এর বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। কিন্তু পাণিনি 'পরোক্ষবৃত্তি' শব্দ কিছুটা ব্যাখ্যা করলেও 'অতিপরোক্ষবৃত্তি' শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি (derivation) করেননি।

৩. পাণিনি সীমিত কিছু ধাতু ও প্রত্যয়কে উৎস হিসাবে গ্রহণ করে সেগুলি দ্বারা শব্দের নির্বচন করেছেন। যাস্ক পরিচিত ধাতু-প্রত্যয় ছাড়াও কাল্পনিক (fictional) ধাতু প্রত্যয় দ্বারা শব্দকে বিশ্লেষণ করেছেন।

৪. *নিরুক্ত*-এর কাজ সেখানেই শুরু যেখানে ব্যাকরণের কাজ শেষ। এইজন্যই যাস্ক *নিরুক্ত*-কে 'ব্যাকরণস্য কাৎর্স্ন্যং' বলা হয়েছে।

Yāska's Etymology of Daṇḍa (By M. A. Mahendale)

যাস্কাচার্য তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত 'দণ্ড্য' শব্দের অর্থ নিরূপণের পর মূল 'দণ্ড' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলেছেন- "দণ্ডো দদতের্ধারযতিকর্মণঃ"[১] অর্থাৎ 'দণ্ড' শব্দটি ধারণার্থক দদতে বা √দদ্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। যদিও দুর্গাচার্য বলেছেন যা অপরাধ বিষয়ে রাজারা ধারণ অর্থাৎ গ্রহণ বা অবলম্বন করেন। স্কন্দস্বামী 'ধারণ' শব্দের অর্থ করেন 'নিরোধ'। তবে এইসব অর্থকে অতিক্রম করে যাস্ককৃত পুরাণোক্ত প্রমাণই √দদ্-ধাতু যে ধারণার্থে প্রযুক্ত তার সঠিক বিশ্লেষণে সক্ষম হয়, সেটি হল- "অক্রূরো দদতে মণিমিত্যভিভাষন্তে"[২]- এর অর্থ হল অক্রূর নামক রাজা মণি ধারণ করেন- 'অক্রূরো ধারযতি মণিম্'। পুরাণোক্ত এই কাহিনীতে 'ধারণ করা' বলতে শুধু হাতের দ্বারা বা মাথায় বা শরীরের যে কোনো অঙ্গে ধরে থাকা বা গ্রহণ করা নয়। কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে

প্রয়োগ না করে, কোনো একজনের বা সকলের প্রতিনিধি হয়ে ধারণ করা, অক্রূর স্যমন্তক মণি ধারণ করেছিলেন মণির অধিকারীর স্বার্থে, জাতির স্বার্থে। মণি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা সে ভোগ করতে পারবেনা, যেটি

সে আগে ভোগ করেছে নিজের স্বার্থে। এরকম শাস্তিমূলক ধারণ করা অর্থে ধারনার্থক √দদ্-ধাতু থেকে দণ্ড শব্দ উৎপন্ন। (ধারযতি = to owe)। অতএব শব্দের উৎপত্তির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক পটভূমি বিশেষ ভূমিকা পালন করে, এটিই M. A. Mahendale এর অভিমত।

Yāska's Use of Kasmāt (By Eivind Kahrs)

'Eivind Kahrs' *নিরুক্তে* 'কস্মাত্' শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। যাস্কাচার্য *নিরুক্ত* নামক গ্রন্থে শব্দের নির্বচনের ক্ষেত্রে মাঝে প্রায়শই 'কস্মাত্' এই শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যেমন- 'অন্নম্ কস্মাত্'?। লক্ষ্মণ স্বরূপ এই প্রশ্নবোধক বাক্যটির অর্থ করেছেন- 'কোন ধাতু থেকে অন্ন শব্দ ব্যুৎপন্ন?', ভাষ্যকার স্কন্দস্বামী ও মহেশ্বর 'কস্মাৎ' শব্দকে ব্যাখ্যা করেছেন 'কস্মাদ্ ধাতোঃ' এই শব্দ দুটি দ্বারা।

'Eivind Kahrs' *নিরুক্ত*-এর 'বাক্' শব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে স্কন্দ- মহেশ্বরের ভাষ্য উল্লেখ করে বলেছেন, স্কন্দ-মহেশ্বরের ভাষ্যের চতুর্থ পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী 'সা চ কস্মাদ্ ধেতোঃ বাক্'? এখানে 'কস্মাদ্ ধেতোঃ' শব্দের অর্থ 'কী কারণে বা কী হেতু' (for what reason 'hetoh')। অর্থাৎ এখানে দেখা যায়, 'ধাতোঃ' স্থানে 'হেতোঃ' বলা হয়েছে। তাঁর মতে সন্ধির দ্বারা 'হেতোঃ' থেকে 'ধেতোর্' এবং অবশেষে 'ধাতোর্' শব্দে পরিণত হয়েছে - হেতোঃ > ধেতোর্ > ধাতোর্। অতএব, 'বাক্' শব্দের নির্বচনে বলা যায়- 'বাক্ কস্মাত্'? এখানে 'কস্মাত্' মানে 'কী কারণের জন্য (কস্মাদ্ হেতোঃ)', 'বাক্' এই নাম। এই প্রসঙ্গে তিনি দুর্গাচার্য ও রাজবাড়ের (Rajvade) মত উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে দুর্গাচার্য বৃত্তিতে বারংবার 'ত্বাত্' অন্ত ব্যাখ্যামূলক শব্দ প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ 'হেতোঃ' শব্দটি তিনি সমর্থন করেছেন বলা যায়। রাজবাড়ের (Rajvade) মতে যাস্ক যেখানে 'কস্মাত্' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা কোনো শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন, সেখানে 'কস্মাত্' শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'কোন ধাতু থেকে এবং কেন? (from what root and why?) এই অর্থে। অবশেষে, Eivind Kahrs বলেছেন- 'ধাতু' নয়, 'হেতু' শব্দই গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে 'কস্মাৎ' শব্দের অর্থ 'কেন'? 'কী হেতু' (কারণ)? (why?; for what reason?).[৩]

Nirukta Uṇādisūtra and Aṣṭādhyāyī (J. Bronkhorst)

আলোচ্য শোধপত্রিকায় *নিরুক্ত*-গ্রন্থ, 'উণাদিসূত্র' এবং পাণিনি দ্বারা বিরচিত *অষ্টাধ্যায়ী* গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক এবং সেই বিষয়ে একাধিক গবেষকের মত গ্রহণ ও খণ্ডন করা হয়েছে।

J. Bronkhorst প্রথমে *নিরুক্ত*-গ্রন্থস্থিত নিপাত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। Folk এর মতে নিপাতের দুটি শ্রেণীবিভাগ বর্তমান। তিনি Folk এর এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন, নিপাতের ভেদ বিষয়ে যাস্কের আলোচনা থেকে নিপাতের চারটি বিভাজনই গ্রহণীয়।

ঐকপদিক শব্দ বলতে তিনি (J. Bronkhorst) বলেছেন যে সমস্ত শব্দের ব্যাকরণগত গঠনের সাথে অন্বিত অর্থ ছাড়াও এক বা একাধিক অর্থ বিদ্যমান এবং এই অর্থবিশিষ্টরূপে বা অর্থের বোধক রূপে শব্দটির ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ জানা নেই, সেই শব্দগুলিকে ঐকপদিক শব্দ বলে। এগুলিকে অব্যুৎপন্ন শব্দও বলা হয়। যেমন- 'আদিত্য' শব্দের 'অদিতেঃ পুত্র' অর্থাৎ অদিতি পুত্র এই অর্থ ছাড়াও সূর্য এই অর্থও বিদ্যমান। কিন্তু সূর্য অর্থের দ্যোতক 'আদিত্য' শব্দের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ অনুপলব্ধ। যাস্ক সেই সব শব্দ আলোচনা করেছেন

যেগুলির ব্যাকরণগত গঠন প্রক্রিয়া সেই সমস্ত শব্দের অর্থ নির্ণয়ে সহায়তা করেনা। ঐকপদিক নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ প্রক্রিয়ার সহায়তার অভাবকেই বোঝানো হয়েছে। যাস্ক ‘দর্বি’, ‘হোমিন্’ শব্দ দুটিকে উণাদিসূত্রের মতোই পরপর উল্লেখ করেছেন। অতএব বলা যায় তিনি এইসমস্ত উণাদিসূত্রের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং এগুলি বর্তমান উণাদিসূত্র দ্বারা সংরক্ষিত হচ্ছে।

আবার যাস্কের মতে ‘পুরুষ’, ‘অশ্ব’, ‘তৃণ’ এই শব্দগুলির অর্থের সাথে অন্বিত কৃদন্ত গঠন নেই কিন্তু এগুলি বর্তমানে উপলব্ধ উণাদিসূত্রে বিদ্যমান। অতএব বলা যায় তিনি এইসমস্ত উণাদিসূত্র জানতেন না। তিনি বেশ কিছু উণাদিসূত্র জানতেন যেগুলি বর্তমানে পাওয়া যায়না।

তাঁর মতে *নিরুক্ত* যতদূর সম্ভব ব্যাকরণকে অনুসরণ করে। এটি ব্যাকরণের পরিপূরক। ব্যাকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা অব্যুৎপন্ন শব্দের ক্ষেত্রেই ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ ব্যাকরণপ্রক্রিয়া ভিন্ন উপায়ে করেছেন।

যাস্কাচার্যের *নিরুক্ত* গ্রন্থের ২.১-২ অধ্যায়ে ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণের পদ্ধতি স্বরূপ ব্যাকরণ অনুমোদিত বর্ণবিপর্যয়, বর্ণলোপ ইত্যাদি নিয়মের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও যাস্ক ও পাণিনি উভয়েই প্রাচীন শব্দের ব্যুৎপত্তিতে √অঞ্চ্ ধাতুর ‘অ’ এর লোপ ঘটিয়েছেন এবং দীর্ঘীকরণ করে ‘প্র’ করেছেন, যেখানে অন্যভাবেও ব্যুৎপত্তি করা যেত। অন্যান্য প্রমান এর সাথে এইদুটি প্রমাণের ভিত্তিতে theime মহাশয় পাণিনি সাপেক্ষে যাস্ককে পরবর্তীকালীন বলেছেন।

- J. Bronkhorst এর মতে ব্যাকরণের কাজ যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখান থেকেই নিরুক্তের কাজ শুরু হয়।
- ব্যাকরণপদ্ধতি শব্দের গঠনের অপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে, যা শব্দের অর্থ অনুসন্ধানে সহায়ক হয়।
- শব্দের বিশ্লেষণে ব্যাকরণের ভূমিকা অসীম কিন্তু যেখানে অর্থের প্রসঙ্গ উপস্থিত সেখানে নিরুক্তই যথার্থ।
- J. Bronkhorst এর মতে আমরা অনুমান করতে পারি, যাস্ক ব্যাকরণের (পাণিনি-ব্যাকরণ) পাশাপাশি উণাদিসূত্রের মতো বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

Words In and Out of History: Indian Semantic Derivation (Nirvacana) and Modern Etymology in Dialogue (Paolo Visigalli)

এই প্রবন্ধ থেকে নির্বচন সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য পেয়েছি সেগুলি হল-

- একটি শব্দ কোন পটভূমিতে আলোচিত হয়েছে সেটি, নির্বচনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ পটভূমি (Context) অনুসারে শব্দের নির্বচন করা যায়। যেমন- ‘কাণুকা’ এই শব্দের নির্বচন (*ঋগ্বেদসংহিতা* ৮/৭৭/৪)।
- শব্দের নির্বচনে বৈদিক ঐতিহ্যেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যেমন- অগ্নি শব্দের নির্বচনে ‘অগ্নিপ্রণয়নকর্ম’কে মাথায় রেখেই নির্বচন করা হয়েছে।
- কোনো কোনো শব্দের (প্রত্যক্ষবৃত্তি) নির্বচন ব্যাকরণানুসারে করা হয়েছে।
- ‘পরোক্ষবৃত্তি’ শব্দের নির্বচন ব্যাকরণ অনুমোদিত ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মানুসারে করতে হয়। যেমন- ‘ধ্’ এর স্থানে হ্’ ইত্যাদি। ‘Paolo Visigalli’ ‘বৃত্তিসামান্য’ শব্দের অর্থ করেছেন- “Similarity with

a phonetic change (vṛttisāmānya) that has been accepted by the grammarians...”[৪] অর্থাৎ ‘ব্যাকরণ সম্মত ধ্বনিপরিবর্তনজনিত সাম্য’।

- বেশ কিছু স্থানে ‘পরোক্ষবৃত্তি’ শব্দের একটি অন্তর্নিহিত স্পষ্ট রূপ বিদ্যমান থাকে, যার দ্বারা পরোক্ষ শব্দটির সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বচনে শব্দের অন্তর্নিহিত স্পষ্ট রূপ থাকেনা। এই ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ ও শব্দের মধ্যে একটা সরাসরি সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। যেমন- শাকপূণির মতানুসারে ‘অগ্নি’ শব্দের নির্বচন।
- নেতিবাচক ভঙ্গীতেও নির্বচন প্রদর্শন করা যায়। যেমন- স্থৌলাষ্ঠীবিকৃত ‘অগ্নি’ শব্দের নির্বচন।
- শব্দটি যে বস্তুর বাচক সেই বস্তুর অভিজ্ঞতামূলক বিশ্লেষণকেও নির্বচনের অঙ্গ হিসাবে ধরা যায়, যেমন- অগ্নি শব্দের নির্বচন- ‘অঙ্গং নযতি সন্নমমানঃ’।[৫]
- নির্বচনে ধ্বনিসাম্য অবশ্যই যেন ধাতুর সাথে অর্থানুসারী হয়।

তথ্যপঞ্জি

[১] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ২/১/২/১৫, পৃষ্ঠাঙ্ক ১৯৭।

[২] তত্রৈব।

[৩] Eivind kahrs, “Yāska’s Use of Kasmāt”. Indo-Iranian Journal (231-237). Page 234.

[৪] Paolo Visigalli, “Words In and Out of History: Indian Semantic Derivation (Nirvacana) and Modern in Itymology Dialogue”. Philosophy East and West, Vol. 67. Page- 1144.

[৫] অমরেশ্বর ঠাকুর (সম্পা.), *নিরুক্তম্* ৭/১৪/৪, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮৬।

***

Select Bibliography

Anirvan. *Vaidīka Sāhitya (Veda-Mīmaṁsa).* Kolkata: Sanskrita Book Dipot, 2017 (Rpt.) (1st ed. 2006).

Bandyopadhyay, Ashok Kumar. Paṇin*īya Vaidika* Vy*ā*karaṇa. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhander, 1418 BY (2nd Edition).

Bandyopadhyay, Dhirendranath. *Saṃskṛta Sāhityer Itihāsa*. Kolkata: West Bengal State Book Board, 2010 (rpt.) (1st ed. 1988).

Bandyopadhyay, Shanti. *Vaidika Sāhityera Rūparekhā*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhander, 2003 (rpt.) (1st ed. 1993).

Bhattacharya, Bishnupada. *Vaidik-Devatā*. Kolkata: Vishwabharati Granthalaya, 1357 BY (1st Edition) (Vishwavidya Sangraha-82).

Bhaṭṭojidīkṣita. *Siddhāntakaumudī.* Vol. 3. Ed. Binodlal Sen. Kolkata: Sadesh, 2005 (rpt.) (2nd imp.).

Chāndogyopaniṣad. Ed. Gambhirananda. *Upaniṣad Granthāvalī.* Vol.1. Kolkata: Udbodhan Karyalaya, 1962.

Chāndogyopaniṣad. Ed. Ganga'Nath Jha. With Sankara's Cemmentary. Madras: The India Printing Works, 1923.

Dayananda, Saraswati. *Satyārtha Prakāsh*. Ed. Durga Prasad. *An English Translation of the Satyarth Prakash*. Lahore: Virjananda Press, 1908 (1st Edition).

___.___. Comp. Dharmapal Arya. With Beng. Trans. Kolkata: Arsha Sahitya Prakash Trast, 2021 (rpt.) (1st ed. 2017).

___. *Ṛgvedadibhāṣyabhūmikā.* Comp. Satish Chandra Mondal. With beng. Trans. Delhi: Arsha Sahitya Prakash Trast, 2019 (1st ed.).

Dharmapal, Gouri. *Veder Bhaṣa O Chanda*. Kolkata: Pashchimbanga Rajya Pustak Parshat, 2015 (rpt.) (1st ed. 1999).

Jaiminīya Brāhmaṇam. Ed. Raghuvir and Lokesh Chandra. Delhi: Motilal Banarasi Das, 1954.

Jaiminīya Upaniṣadbrāhmaṇam. Ed. Bhagabaddutta. Lahore: Vidya Prakash Press, 1921(1st Edition) (Shrimaddayananda Mahavidyalaya Sanskritagranthamala- 3).

Kenopaniṣad. Ed. Gambhirananda. *Upaniṣad Granthāvalī.* Vol.1. Kolkata: Udbodhan Karyalaya, 1962.

M. A. Mahendale. "Yāska's Etymology of Daṇḍa". American Oriental Society. Vol. 80, No. 2, 1960, Pp. 112-115.

Max Müller, Friedrich. *A History of Ancient Sanskrit Literature*. New Delhi: Asian Educational Services, 1993 (rpt.) (1st pub. 1859).

Musalgaonkar, Gajananshastri and Rajeshwar (Raju) Shastri Musalgaonkar. *Vaidika Sāhitya kā Itihāsa*. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 2009 (rpt.). (The Kashi Sanskrit Series 275).

Niruktaślokavārttika. Ed. Vijay Pal. Kolkata: Srimati Savitridevi Bagadiya Trust, 1982.

Pāṇini. A*ṣṭā*dhy*āyī.* Ed. Si. Shankarram Shastri. A*ṣṭā*dhy*āyīsūtrapāṭhaḥ*. Delhi: Sharada Publishing House, 1994.

Pāṇini. *Uṇadikoṣḥ*. Ed. Satyabrata Shastri. Rajasthan: Kaka Printers, 1966.

Patañjali. *Mahābhāṣya*. Ed. Karunasindhu Das. *Pāṇinīya Mahābhāṣya.* With Beng. Trans. of Moksadacharan Samadhayi. Kolkata: Sadesh, 2005.

Ṛgvedabhāṣyopakramaḥ. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2009 (rpt.) (1st ed. 2005).

___.___. Ed. With Hindi comm. Sharada Chaturvedi. *Ṛgveda-Bhāṣyabhūmikā*. Sharadi. Varanasi: Chowkhamba Krishnadas Academy, 2016 (rpt.). (Krishnadas Sanskrit Series 58).

Śaunaka. *Bṛhaddevatā*. Ed. Ramkumar Rai. *The Bṛhad-devatā*. With Hindi trans. and Appendices. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 2019 (Rpt.).

Sāyaṇa. Ṛ*gveda-Bhāṣyabhūmikā*. Ed. With Beng. Trans. Gurushankara Mukhopadhyaya.

Shabar Swami. *Jaiminīya-Mīmāṃsa-Bhāṣyam.* Ed. YudhiSthira Mimangsaka. *Mīmāṃsa-Śābar-Bhāṣyam.* With Hindi Trans. And Notes. Vol. 2. Hariyana: Ramlal Kapur Trast Press, 1978 (1st Edition).

Skandasvami and, Mahesvara. *Nirukta-bhāṣya-tīkā*. Ed. Jnanaprakash Shastri and Naresh Kumar. Delhi: Parimal Publication, 2012 (2nd ed.). (Parimal Sanskrita Granthamala- 104).

___. *Niruktabhāṣyaṭīkā. Vol. 3 and 4.* Ed. Lakshman Sarup. With intro. Lahore: The University of the Panjab, 1934.

___. *Niruktabhāṣyaṭīkā*. Ed. Lakshman Sarup. Lahore: The University of the Panjab, 1931.

Tāṇḍyamahābrāhmaṇam. With comm. Vedārthaprakāś. Part 1, 2. Delhi: Chaukhamba Sanskrita Pratisthan, 1795 (Shakabda).

Vedaby*ā*sa. *Mahābhāratam, Ādiparva to Bhīṣmaparva*. With comm. of Nīlakan*ṭ*ha. Vol. 1. Ed. Panch*ā*nan Tarkaratna Bha*ṭṭ*ac*ā*rya. Kolkata: Bangabsi Electro Machine, 1830 (Shakavda) (2nd Edition).

Vedaby*ā*sa. *Mahābhāratam. With Beng. Trans. and comm. Bhāratabhābadīpa and Bhāratakaumudī.* Shantiparvam 37. Kolkata: Vishwabani Prakashani, 1407 BY (2nd Edition).

Vidyasagar, Ishwarchandra. *Samagra Vyākaraṇ(a) Kaumudī.* Ed. Hemchandra Bhattacharya. Kolkata: Chalantika Prakashak, 1416 BY (12th rpt.) (1st ed. 1370).

Visigalli, Paolo. "Words In and Out of History: Indian Semantic Derivation (Nirvacana) and Modern Etymology in Dialogue". Philosophy East and West. Vol. 67. Published by University of Hawai'i Press, 2017, Pp. 1143-1190.

Yāska. *Nirukta*. Ed. Amareswara Thakur. With Beng. Trans. and Notes. Part 1. Kolkata: University of Calcutta, 2017 (rpt.) (1st ed. 1955). (The Asutosh Sanskrit Series No. 5).

___.___. Ed. Amareswara Thakur. With Beng. Trans. and Notes. Part 2. Kolkata: University of Calcutta, 2005 (rpt.) (1st ed. 1955). (The Asutosh Sanskrit Series No. 5).

___.___. Ed. Amareswara Thakur. With Beng. Trans. and Notes. Part 3. Kolkata: University of Calcutta, 2016 (rpt.) (1st ed, 1955). (The Asutosh Sanskrit Series No. 5).

___.___. Ed. Amareswara Thakur. With Beng. Trans. and Notes. Part 4. Kolkata: University of Calcutta, 2005 (rpt.) (1st ed. 1955). (The Asutosh Sanskrit Series No. 5).

___.___. Ed. and Eng. Trans. Lakshmana Swarupa. With Hin. Trans. Satyabhushana Yogi. *Nighaṇṭu Tathā Nirukta*. Delhi: MLBD, 1985 (rpt.) (1st ed. 1967).

___.___. Ed. Brahmachari Medhachaitanya. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhander, 1424 BY (1st ed.).

___.___. Ed. Mukunda Jha Bakshi. With comm. *Niruktavivṛtti*. Delhi: Chowkhamba Sanskrit Prathisthan, 2016 (rpt.).

___.___. Ed. Taraknath Adhikari. *Yāska's Nirukta (Chapter 1).*With Beng. Trans. and exposition. Kolkata: Sanskrit Book Depot, 2012 (rpt.).

***